লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

প্রকাশনার ৯৫ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৮০ বর্ষ | ১৮তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ চৈত্র, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ | ১২ রজব, ১৪৩৯ হিজরি | ৩১ আমান, ১৩৯৭ হি. শা. | ৩১ মার্চ, ২০১৮ ঈসাব্দ

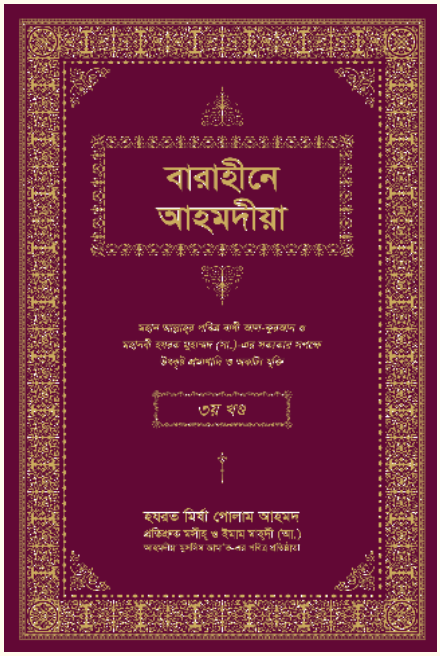

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র তৃতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত, 'বারাহীনে আহমদীয়া' তৃতীয় খণ্ডের মূল পুস্তকটি যেন হঠাৎ করেই শেষ হয়েছে বলে প্রতিভাত হয়। কেননা, তৃতীয় খণ্ডের মূল পুস্তক এবং পাদটীকা-২-এর বিষয়বস্তু চলমান রাখা হয়েছে আর যা ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত পুস্তকটির চতুর্থ খণ্ডে গিয়ে সমাপ্ত করা হয়েছে।

'বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তকটির মূল উর্দু সংস্করণে প্রতিপাদ্য মূলবিষয়, টীকা এবং পাদটীকা একই পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু পাঠকের সুবিধার্থে অনুদিত এই গ্রন্থে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সদয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মূল পাঠ একটানা ভাবে শেষ করার পর যথাক্রমে টীকা-১১ এবং পাদটীকা ১ ও ২ অংশ সন্নিবেশিত রয়েছে।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফুর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) প্রণীত
'শরায়াতে বয়আত অওর আহমদী কি যিম্মাদারীয়া'
পুস্তকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে

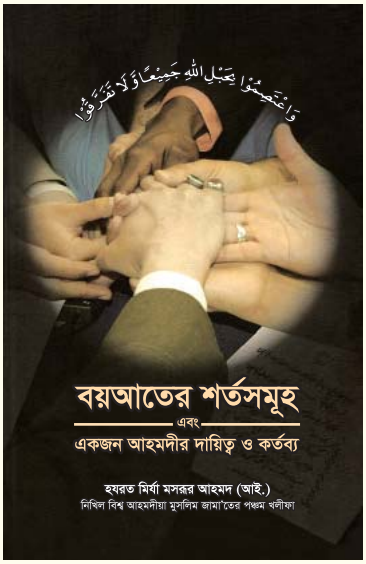

পুস্তকটি সম্পর্কে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দিক নির্দেশনা (ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত)

আমরা যারা ইমাম মাহদী (আ.) বা তাঁর খলীফার নিকট বয়আত গ্রহণ করি তারা এই শর্তগুলো পড়ে থাকি- সাধারণভাবে এর অর্থ বুঝতে পারি কিন্তু এর যে তত্ব ও মাহাত্ম্য তা অনুভব করতে পারি না। যদি আমরা এর মাহাত্ম্য অনুভব করতে পারি তাহলে এই শর্তগুলো প্রতিপালনে আমাদের ঐকান্তিকতা ও আগ্রহ এবং ইচ্ছা শক্তি আরো বেগবান হয়ে যাবে।

পুস্তকটি প্রত্যেক আহমদীর জন্য একটি 'গাইড বুক' বিশেষ। হুযূর (আই.)-এর মমতা মাখা এ পুস্তকটি থেকে উপকৃত হতে আমাদের সকলের প্রচেষ্টারত থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় সন্তুষ্টির চাদরে আমাদের আচ্ছাদিত হওয়ার সৌভাগ্য দানে কৃপাধন্য করুন। আমীন।

নিবেদক

মোবাশশের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

আপনার কপি সংগ্রহ করেছেন কি? প্রাপ্তিস্থান: কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী

সম্পাদকীয়

দেশ ও জাতির প্রতি নিরঙ্কুশ ভালবাসা আর আনুগত্যের সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা কেবলমাত্র ইসলামই দেয়

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্বয়ং সাহাবাগণকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে, ইসলামে নিজ দেশকে ভালবাসা লালিত ধর্মবিশ্বাসের এক অংশ। সুতরাং, আন্তরিক দেশপ্রেম ইসলামের অপরিহার্য এক আবশ্যকতা। সত্যিই ইসলামে বিশ্বাসী এক মুসলমান, ঐকান্তিকভাবে যে আল্লাহ তা'লাকে ভালবাসে, সে তার স্বজাতিকে নিখাঁদরূপে ভালবাসবে এমনটিই অবধারিত।

তাই, এটি বেশ স্পষ্ট যে, খোদাপ্রেমী এক ব্যক্তির ভেতর স্বজাতির প্রতি মমত্ববোধ আর ঐশীপ্রেম উভয় মাঝে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকতেই পারে না। 'দেশপ্রেম'কে ইসলাম ঈমানের অঙ্গরূপে নির্ধারণ করায় একজন মুসলিম তার নিজ দেশের প্রতি আনুগত্যের মান সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে, কেননা মহানবী (সা.) এটি বুঝিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌র ভালোবাসা পাওয়ার এবং তাঁর নৈকট্যলাভের এটি একটি উত্তম মাধ্যম।

সুতরাং এক মুসলিম, সত্যই যে ঐশীপ্রেম অন্তরে ধারণ করে, কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা বা বাধা বা প্রতিরোধ কখনও তাকে তার নিজ দেশের প্রতি সত্যিকারের ভালবাসা ও আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততা প্রদর্শন পুরোমাত্রায় ঠেকিয়ে দিতে সক্ষম হবে, এটি সম্ভবই নয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে, নির্দিষ্ট কতিপয় কর্তৃত্বপরায়ণ দেশে আমরা ধর্মীয় অধিকার ক্ষুন্ন হতে দেখছি, এমনকি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হতেও দেখতে পাচ্ছি। উন্নত সভ্যতার দাবীকালের এযুগে, আদৌ তা গ্রহণীয় হতে পারে না।

আনুগত্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আরেকটি শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, মানুষের সেসব থেকে দূরে থাকা উচিত, যা অনাহুত, অবাঞ্ছিত এবং শেষমেষ যা কোননা কোন ধরণের বিদ্রোহে গড়ায়।

ইসলামী শিক্ষামালায় মহাপরাক্রমশালী সর্বশক্তিমান আল্লাহ দেশের বা সরকারের বিরুদ্ধে সবরকমের বিশ্বাসঘাতকতা বা বিদ্রোহ নিষিদ্ধ করেছেন। এই কারণে যে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া বিদ্রোহ, যা দেশ ও জাতির শান্তি এবং নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক এক হুমকি। প্রকৃতপক্ষে, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বা বিরোধীতা যেখানে ঘটে, বহিরাগতরা অভ্যন্তরীণ বিরোধের সুযোগ নিয়ে সেখানে বিরোধিতার অগ্নিতে ঘি ঢেলে তাদের নিজেদের সুবিধা-স্বার্থ আদায়ে অপতৎপরতা চালায়। নাগরিকদের অদূরদর্শী এমন আনুগত্যহীনতার পরিণতিতে একটি জাতির চরম ক্ষতি সাধিত হয়।

এ সব কথা মনে রেখে, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যে প্রত্যেক নাগরিকের উচিত ধৈর্য প্রদর্শন, নৈতিকতা অবলম্বন এবং দেশের আইন মান্য করে চলা।

সাধারণতঃ আধুনিক যুগে, অধিকাংশ সরকার গণতান্ত্রিকভাবে চালানো হয়। তাই কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি সরকার পরিবর্তনের ইচ্ছা করে, তবে সঠিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তা করা উচিত। ব্যালট বাক্সে ভোট দিয়ে তাদের নিজেদেরই তা করা উচিত। ব্যক্তিগত পছন্দ বা আগ্রহের ভিত্তিতে ভোট প্রদান করা উচিত নয়।

আসলে, একজন নাগরিকের ভোটাধিকার প্রয়োগ দেশের প্রতি তার 'আনুগত্যের মান' নির্দেশক। এজন্য নিজের ব্যক্তিগত সুবিধার প্রতি না তাকানোই উচিত। এর পরিবর্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে তার কর্তব্য হল, কোন্ পার্টি বা প্রার্থী যার মাধ্যমে সমগ্র জাতির অগ্রগতি সুষমভাবে সম্পন্ন হতে সহায়ক তা নির্ধারণ করা, প্রার্থী মূল্যায়নে ইসলামী শিক্ষানুযায়ী সেই অগ্রাধিকারই তার বিবেচ্য।

সব পরিস্থিতিতে আনুগত্য এবং দেশপ্রেম সমুন্নত রাখা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মহান প্রতিষ্ঠাতার শেখানো এক সোনালী নীতি। এজন্য প্রত্যেক জাতির নেতাদের উচিত সকল মানুষের অনুভূতি এবং সম্মান শ্রদ্ধার সাথে বিবেচনায় নেয়া।

নেতারা এবং তাদের সরকারের সত্য ও ন্যায়বিচারের আইন প্রতিষ্ঠায় জোরদার চেষ্টা করা উচিত যাতে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয় যে, আইন প্রণয়ন দুর্যোগ সৃষ্টির একটি উপায়, মানুষের মাঝে বিরাজমান এই হতাশাপূর্ণ ধারণা যেন কেটে যায়।

অন্যায় অবিচার এবং নিষ্ঠুর নির্মমতা নির্মূল করা উচিত, এর পরিবর্তে সত্য ও ন্যায়বিচারের জন্য সংগ্রাম করা উচিত। এটি করার সবচেয়ে ভাল উপায় হল মহান সৃষ্টিকর্তাকে চেনা আর তাঁরই আনুগত্য করে তাঁর সাথে সম্পর্ক জুড়ে নেয়া।

আল্লাহ্ চাইলে এতে যদি আমরা সক্ষমতা লাভ করি, তাহলে দেশের সমস্ত মানুষের আনুগত্যের খুবই উচুঁ মান আমরা নিজ চোখে দেখতে পাব আর আমাদের নের্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত শান্তি এবং নিরাপত্তা সারা বিশ্বজুড়ে দৃশ্যমান হবে, ইনশা'আল্লাহ্।

স্বাধীনতা অর্জনের মহান এই মাসে আল্লাহ তা'লা সমীপে এটিই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

সূচিপত্রে

৩১ মার্চ, ২০১৮

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

'বারাহীনে আহমদীয়া' (৪র্থ খণ্ড) ৬
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৮
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
২৭ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের **জুমুআর খুতবা**

বিশ্বশান্তি: সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান ১৬
হযরত মির্যা তাহের আহমদ

কলমের জিহাদ ১৮
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

আমি কিভাবে আহমদী হলাম ২০
মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী

কবিতা– নবীজির (সা.) প্রতি দরূদ ২২
সিবগাতুর রহমান

বক্তৃতা– বিষয়: প্রকৃত নামায-ই সকল কল্যাণের উৎস ২৩
বক্তা: মোহতরম সৈয়দ মাহমুদ আহমদ শাহ সাহেব
(হুযূর আকদাস (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি)

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ) ২৭
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)
প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

লাল চায়ের শতগুণ ২৯
সংগ্রাহক: কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

সাদাকাতে মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও ২৩ মার্চ ৩০
মাহমুদ আহমদ সুমন

জামেয়ায় ছাত্র ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ৩৫

ইসলাম: বিশ্ব-সমস্যা সমাধানের পথিকৃৎ ৩৬
মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি– ৩৯
আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান
বাইতুল ফুতুহ মসজিদ-এর
নতুন প্রশাসনিক ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

দুই দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন ৪০
রাঙ্গামাটি জেলার আহমদীয়া নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাহিল্যা-বাঘাইছড়ি
পুরস্কার বিতরণ ও অভিভাবক সম্মেলন এক ভিন্নমাত্রায় অনুষ্ঠিত

সংবাদ ৪৩

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা বনী ইসরাঈল-১৭

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ﴿٣٩﴾

৩৯। এগুলোর মাঝে প্রত্যেকটি মন্দ আচরণই তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণ্য।

ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰۤى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ؕ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا ﴿٤٠﴾

৪০। এসব সেই প্রজ্ঞার (একাংশ) যা তোমার প্রভু-প্রতিপালক তোমার প্রতি ওহী করেছেন। আর তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে উপাস্য নির্ধারণ করো না, নতুবা তোমাকে লাঞ্ছিত (ও) ধিকৃত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

اَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ؕ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ﴿٤١﴾ ع

৪১। তোমার প্রভু-প্রতিপালক কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং ফিরিশতাদের মাঝ থেকে (নিজের জন্য) কন্যাদের গ্রহণ করে নিয়েছেন? নিশ্চয়ই তোমরা এক ভয়ানক কথা বলছো।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ؕ وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا ﴿٤٢﴾

৪২। আর নিশ্চয় আমরা এ কুরআনে (আয়াতগুলো) বিভিন্ন আঙ্গিকে[১৬২১] বর্ণনা করেছি যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু এটা কেবল তাদের ঘৃণাকেই বাড়িয়ে দিচ্ছে।

قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗۤ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا ﴿٤٣﴾

৪৩। তুমি বল, 'তাদের কথা অনুযায়ী তাঁর সাথে যদি আরো উপাস্য থাকতো তাহলে এসব (মুশরিক তাদের উপাস্যের সাহায্যে) আরশের অধিপতি পর্যন্ত (পৌঁছার) কোন পথ খুঁজতো।'

سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ﴿٤٤﴾

৪৪। তারা যা বলে তিনি এ থেকে অতি পবিত্র এবং অনেক ঊর্ধ্বে।

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿٤٥﴾

৪৫। সাত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোতে যারা আছে সবাই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর সব কিছুই তাঁর প্রশংসাসহ[১৬২২] পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় রত রয়েছে। কিন্তু তোমরা এদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করাকে বুঝতে পার না। নিশ্চয় তিনি পরম সহিষ্ণু, অতি ক্ষমাশীল।

১৬২১। ঐশী-কিতাব, যাতে অত্যন্ত জরুরী বিষয়াবলীর কথা অন্তর্ভুক্ত থাকে, এতে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু যা প্রদত্ত মূল বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা বার বার পুনরাবৃত্তি হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয়ও বটে। কোন বিষয়বস্তুকে যখন খোলাসা বা স্পষ্টভাবে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝাবার উদ্দেশ্যে অথবা নতুন কোন আপত্তি খণ্ডনের জন্য পুনরুল্লেখ করা হয় তখন বিবেকবান এবং বুদ্ধিমান কোন লোক এর প্রতিবাদ করে না।

১৬২২। 'সাত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোতে যারা আছে সবাই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে', এ বাক্যটি সমষ্টিগতভাবে প্রমাণ করে, সারা বিশ্ব আল্লাহ তা'লার একত্ব প্রকাশ করে চলেছে। 'আর সব কিছুই তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় রত রয়েছে' বাক্যটি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সব বস্তুই স্বতন্ত্রভাবে পবিত্র ঐশী সত্তার একত্বের প্রকাশক। প্রথমোক্ত বাক্যের মর্ম হলো বিশ্বজগতে বিদ্যমান শৃঙ্খলা ও চমৎকার ব্যবস্থা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে, এর সৃষ্টিকর্তা এক এবং অদ্বিতীয়। শেষোক্ত বাক্যটির মর্মার্থ হলো এ বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু নিজ নিজ এলাকায় বা কর্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থেকে অনুপমভাবে আল্লাহ তা'লার বিভিন্ন প্রকার গুণের কার্যকারিতা প্রদর্শন করছে।

হাদীস শরীফ

নিজের অবস্থার পরিবর্তন নিজে না করলে আল্লাহ্‌ও তা পরিবর্তন করেন না

জাতির মাঝে, লোকদের মাঝে আশা, উৎসাহ, উদ্যম ও সৎ সাহসের সঞ্চার করতে হবে তবেই জাতি বা গোষ্ঠী উন্নতি করবে। চেষ্টা না করে এর পরিবর্তে যদি বলতে থাকা হয় যে, ধ্বংস হয়ে গেল– তবে তা ক্ষতিই বয়ে আনে।

কুরআনঃ

নিশ্চয় আল্লাহ্ কখনও কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করে (সূরা রা'দ: ১২)

হাদীসঃ

আন আবী হুরায়রাতা ক্বলা আন্না রসূলাল্লাহে (সা.) ক্বলা ইযা ক্বলার রসূলু হালাকান্নাসু ফাহুআ আহলাকাহুম (মুসলিম)।

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূললুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি অন্যদের সম্বন্ধে বলে, সে (বা তারা) ধ্বংস হয়ে গেল বস্তুতঃ সে ব্যক্তি এই কথা বলে তাকে (বা তাদেরকে) ধ্বংস করে দেয়। (অথবা লামের উপর পেশ দ্বারা পড়লে হবে সে নিজেই তার চাইতে বেশী ধ্বংসপ্রাপ্ত)।

ব্যাখ্যাঃ

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস মানুষের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার কথা বর্ণনা করে উত্তম জাতিতে পরিণত হবার পদ্ধতি বর্ণনা করছে।

মানুষের মাঝে উন্নতি লাভের জন্যে সব কিছু রেখে দেয়া হয়েছে। কিন্তু মানুষ তার সঠিক ব্যবহার করে না। কেউ অহংকার অহমিকায় ভুগে, আবার কেউবা হীনমন্যতায়। বস্তুতঃ এ পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষ হীনমন্যতায় ভোগে যা মিথ্যা অহংরূপে তাদের মাঝে বিদ্যমান।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসে যে বিষয়টি বলা হচ্ছে তা হলো, জাতির মাঝে, লোকদের মাঝে আশা, উৎসাহ, উদ্যম ও সৎ সাহসের সঞ্চার করতে হবে তবেই জাতি বা গোষ্ঠী উন্নতি করবে। চেষ্টা না করে এর পরিবর্তে যদি বলতে থাকা হয় যে, ধ্বংস হয়ে গেল– তবে তা অত্যন্ত হতাশার বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেন, এভাবে বললে, তারা নিরুৎসাহিত হয়ে হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করবে। হযরত রসূল করীম (সা.) একবার এক সৈন্যদল প্রেরণ করেন। তারা সেখান থেকে পরাস্ত হয়ে মদীনায় ফিরে এলো। 'ইসলামে পলায়ন করা হারাম আর আমরা পলায়ন করেছি' এই ভেবে তারা লজ্জায়-শরমে হুযূর (সা.)-এর সামনে আসতো না। এক সময় হুযূর (সা.) তাদেরকে মসজিদের এক কোণায় মুখ লুকিয়ে বসে থাকতে দেখলেন। হুযূর (সা.) তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? লজ্জায় তারা মাথা নীচু করে বল্লো, আমরা পলায়নকারী। তিনি (সা.) তাদের অবস্থা আঁচ করে বল্লেন, "তোমরা পলায়নকারী নও। তোমরা শক্তি অর্জন করে আক্রমণের জন্যে পিছিয়ে এসেছো। তোমরা অন্য কারো কাছে যাওনি বরং আমার কাছে এসেছো। আমি তোমাদের নেতা হয়ে আবার তোমাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যাবো"।

সুবহানাল্লাহ্! কতই না উত্তম এ আচরণ আর কত উত্তমই না এই শিক্ষা! তিনি (সা.) সাহাবাদের মনের অবস্থা আঁচ করে কত সুন্দর কথায় মন্তব্য করলেন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দিকে তাকালে দেখতে পাবো কীভাবে হীনমন্যতায় আক্রান্ত হচ্ছি আমরা, আর কীভাবে নিজ সন্তান-সন্ততিকে হীনমন্যতার শিকারে পরিণত করছি।

কুরআান এবং হাদীস বলে, এরূপ ব্যধিগ্রস্তরা কখনও সফলতা লাভ করতে পারে না বরং ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন সর্বদা সতেজ মনের অধিকারী হই। মৃত্যুর আগেই যেন মনের দিক হতে মৃত্যুবরণ না করি, আমীন!

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে সম্পূর্ণরূপে যারা পরিহার করে তাঁদেরকে খোদা তা'লা ভিন্নরূপে ভালোবাসেন

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

খোদার রীতি হলো, তিনি তাদের হৃদয়কে সত্যে পরিপূর্ণ করেন এবং তাঁদের হৃদয়ে-সূক্ষ্ম জ্ঞানের ধারা সঞ্চালন করেন। তিনি তাদের চিন্তা-চেতনাকে পবিত্র করেন এবং তাঁদের মাঝে পবিত্র প্রজ্ঞার পরিস্ফুটন ঘটান আর পরিণতি উপলব্ধি করার ও ধ্বংসস্থল সম্পর্কে সাবধান থাকার জ্ঞান দান করেন। সকল কল্যাণ তাদের দিকে প্রবাহিত করেন আর সকল অকল্যাণ হতে তাঁদের দূরে রাখেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁদেরকে কুরআনের তত্ত্ব ও নবী (সা.)-এর সুন্নতের জ্ঞান দান করেন এবং নিজ তত্ত্বাবধানে তাঁদের লালন-পালন করেন ও নিজ পথে পরিচালিত করেন। তিনি তাঁদেরকে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক নিয়ামতে ভূষিত করেন, একই সাথে এমন সকল বিষয় ও স্থান যা স্খলণের কারণ হতে পারে তা থেকে সুরক্ষিত রাখেন ও তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। তাঁদেরকে ইসলামের (সীমানা ও শিক্ষার) রক্ষণাবেক্ষণকারীদের অন্তর্ভূক্ত করেন। তাঁদের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করেন এবং তাঁর নৈকট্য লাভের প্রতি তাঁদের আকৃষ্ট করেন যা সকল কল্যাণের উৎসস্থল। যার ফলশ্রুতিস্বরূপ কল্যাণের অফুরন্ত সঞ্জীবনী ধারা প্রতিনিয়ত তাদের দিকে প্রবাহিত হয় আর এই ঐশী প্রস্রবণের কল্যাণে তাঁদের হৃদয়ে বিভিন্ন প্রকারের জ্যোতি বা আলোর ফুৎকার করা হয়। মানুষ চেষ্টা করে পুণ্যকর্ম করে আর তাঁরা করেন সহজাত প্রেরণায়।

তাঁদের হাতে পুণ্যকর্ম তাঁদের সুস্থপ্রকৃতির তাড়নায় সাধিত হয়, কৃত্রিমভাবে নয়। যেভাবে ঝর্ণা প্রবল বেগে প্রবহমান থাকে এঁদের মাঝে প্রকৃতিগত সাধুতা সেভাবে বিরাজ করে। কঠিন কাজ সম্পাদনে অন্যদের যেমন কষ্ট হয় তাঁদের তা হয় না। ভয়ের মুহূর্তে তুমি তাঁদেরকে পর্বতের মত অবিচল দেখতে পাবে এবং চরম বিপদের সময় তাঁদের বীরত্ব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। তাঁরা চারিত্রিক গুণে গুনান্বিত হন এবং চরিত্র বিধ্বংসী সকল কাজকে তাঁরা এড়িয়ে চলেন। তাঁরা অপারগতায় নয় বরং ভালোবাসার প্রেরণায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকেন।

বিপদের ভয়াবহতার আশঙ্কায় নয় বরং খোদার সন্তুষ্টির জন্য তাঁরা প্রাণ উজাড় করে দেন। নিজেদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে হলেও প্রভুর নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। তাঁরা সৃষ্টিকে কষ্ট দেয়া পছন্দ করেন না। তুমি তাঁদের মধ্যে নোংরা স্বভাব ও মানুষের ছিদ্রান্বেষণ করার অভ্যাস দেখবে না। তাঁরা (অর্থাৎ ওলীগণ) আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি দয়ালু ও অনুগ্রহশীল এবং মানুষের চাওয়া-পাওয়ার আশা-আকাঙ্খার মূল কেন্দ্র আর এতিম ও বিধবাদের আশ্রয়স্থল হয়ে থাকেন। তাঁরা পঙ্কিলতা, কুটিলতা এবং সকল প্রকার অন্ধকার থেকে দূরে থাকেন। তাঁরা অলৌকিক ও ঈমানী ঐশী নূরের জ্যোতিতে বলীয়ান হয়ে থাকেন। তাঁদের হৃদয়-আঙ্গিনা এমন আধ্যাত্মিক প্রাণীকূলের বিচরণস্থল যারা অন্যদের কাছে ভয়ে ধরা দেয় না। তাঁরা খোদার দ্বারে সেজদাবনত অবস্থায় থাকেন। তাঁদের আত্মা তাঁর ভালোবাসার সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকে। তাঁরা কুপ্রবৃত্তি, কামনা-বাসনা এবং ইচ্ছা ও অভিপ্রায়কে পরিহার করেন। প্রবৃত্তি ও এর তাড়না কাকে বলে তা তাঁরা জানেন না। খোদা তা'লা নিজ প্রজ্ঞানুসারে যেভাবে চান তাঁদের পরিচালিত করেন। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করার ফলে তাঁদেরকে খোদা তা'লা ভিন্নরূপে ভালোবাসেন। তারপর করুণাবশতঃ তাঁদেরকে নিজ বান্দাদের প্রতি প্রেরণ করেন। তাঁরা মানুষকে কল্যাণ, সাধুতা, পুণ্য ও সাফল্যের প্রতি আহবান করেন।

[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রণীত 'হামামাতুল বুশরা' বাংলা সংস্করণ পৃ: ০২-০৩ থেকে উদ্ধৃত]

‘বারাহীনে আহমদীয়া’

৪র্থ খণ্ড

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(৪র্থ কিস্তি)

৫ম মুখবন্ধঃ

যেই নিদর্শনকে বিবেক সনাক্ত করে তার খোদার পক্ষ থেকে হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তা সেসকল নিদর্শন হতে সহস্র সহস্র গুণ শ্রেয় হয়ে থাকে যা কেবল গল্প-কাহিনী খাতে উদ্ধৃত করা হয়ে থাকে।

এই প্রাধান্যের দু’টো কারণ আছে। প্রধাণত: সাবেক গ্রন্থাবলী হতে উদ্ধৃত নিদর্শন, যখন দেখানো হয়েছে তার শত শত বছর পর এমন ঐতিহাসিক বা পরম্পরাগত নিদর্শন দেখানো আমাদের জন্য পরীক্ষিত ও অনুভূত বিষয়ের মর্যাদা রাখে না। আর পরম্পরাগত (মনকূলী) সংবাদ হওয়ার কারণে এর সেই মর্যাদা লাভও হতে পারে না, যা **রয়েছে** দেখা ও পর্যবেক্ষণগত বিষয়ের।

দ্বিতীয়ত: যারা পরম্পরাগত নিদর্শনাবলীর অভিজ্ঞতা **লাভ** করেছে যা যুক্তি-বুদ্ধির কর্মগন্ডির বাইওে, তা তাদের জন্য পূর্ণ প্রশান্তির কারণ**।** গণ্য হতে পারে না।

কেননা অনেক এমন বিস্ময়কর বিষয়াদিও রয়েছে যা ভেল্কিবাজরা দেখিয়ে বেড়ায় যদিও তা ধোঁকা ও প্রতারণাই।

কিন্তু এখন যারা অমঙ্গলকামী বিরোধী তাদের সামনে কিকরে প্রমাণ করা যায় যে, নবীদের পক্ষ থেকে এধরণের যে বিস্ময়কর বিষয়াদী প্রকাশ পেয়েছে, যেমন কেউ সাপ বানিয়ে দেখানো আর অন্য কোন মৃতকে জীবিত করে দেখানো এমন হস্তক্ষেপ হতে পবিত্র যা ভেল্কিবাজ মানুষ করে বেড়ায়।

এই সকল সমস্যা কিছুটা আমাদের যুগেই সৃষ্টি হয় নি বরং সেসকল যুগেই হয়ত এসকল সমস্যা দেখা দিয়ে থাকবে। যেমন আমরা যোহনের ইঞ্জিলের ৫ অধ্যায়ের ২ থেকে ৫ **শ্লোক** পর্যন্ত পড়লে তাতে এটি লেখা পাই যে...

২ যিরূশালেমে মেষ-ফটকের কাছে একটা পুকুর আছে; সেখানে পাঁচটা ছাদ-দেওয়া জায়গা আছে। ইব্রীয় ভাষায় পুকুরটার নাম বৈথেস্‌দা।

৩ সেই সব জায়গায় অনেক রোগী পড়ে থাকত। অন্ধ, খোঁড়া, এমন কি শরীর যাদের একেবারে শুকিয়ে গেছে তেমন লোকও তাদের মধ্যে ছিল।

৪ একজন স্বর্গদূত সময়ে সময়ে ঐ পুকুরে নেমে এসে জল কাঁপাতেন, আর তার পরেই যে প্রথমে জলের মধ্যে নামত তার যে কোন রোগ ভাল হয়ে যেত। ঐ সব রোগীরা জল কাঁপবার অপেক্ষায় সেখানে পড়ে থাকত।

৫ আটত্রিশ বছর ধরে রোগে ভুগছে তেমন একজন লোকও সেখানে ছিল।

এখন জানা কথা যে, সে ব্যক্তি যে ঈসার নবুয়্যত ও তাঁর নিদর্শনাবলীর অস্বীকারকারী যোহনের এই **শ্লোক যখন** পড়বে এবং এমন চৌবাচ্চার সংবাদ পাবে, যা হযরত ঈসার **দেশে আদি থেকে চলে আসছিল আর যাতে আদি হতে এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল যে, রোগ যতই ভয়াবহ হোক না কেন তাতে একবার ডুব দিলেই সকল প্রকার রোগ তা যত ভয়াবহই হোক না কেন নিরাময়** করে দিত, অনর্থক তার হৃদয়ে এক দৃঢ় ধারণা সৃষ্টি হবে যে হযরত ঈসা বিস্ময়কর অলৌকিক লীলা **যদি** দেখিয়ে থাকেন তা হলে তার কারণ এটিই হবে যে, সেই পুণ্যবান ব্যক্তি হয়ত চৌবাচ্চার পানিতে কোনভাবে কারসাজি বা হস্তক্ষেপ করে **এ ধরণের** অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করে থাকবেন।

কেননা, **পৃথিবীতে সদা** এমন উধৃতির **দৃষ্টান্ত** অগণিত ছিল, আর এখনও আছে আর যুক্তি

ও বিবেকের নিরিখে একথা একান্ত সঠিক এবং সহজেই অনুমেয় যে, হযরত ঈসার হাতে অন্ধ ও খোঁড়াদের আরোগ্য লাভ **যদি** হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চিৎভাবে হযরত ঈসা এই ব্যবস্থাপত্র এই চৌবাচ্চা হতে চুরি করে থাকবেন।

আর নির্বোধ ও অতি সরল লোকদের মাঝে যারা কথার গভীরে অবগাহন করে না আর প্রকৃত সত্য সনাক্ত করতে পারে না তারা একথা ছড়িয়ে দিয়ে থাকবে যে, এক ফিরিশতার মাধ্যমে এমন সব কাজ করে **থাকবে,** বিশেষ করে যেখানে একথাও প্রমাণিত যে হযরত ঈসা এই চৌবাচ্চায় প্রায়শঃ যেতেন।

এক কথায়, বিরোধীদের দৃষ্টিতে এমন নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে যা আদি হতে চৌবাচ্চা প্রদর্শন করে আসছে; হযরত ঈসা সম্পর্কে বহু সন্দেহ এবং সংশয় সৃষ্টি হয়। আর এ কথা প্রমাণে বড় সমস্যার মুখে পড়তে হয় যে, হযরত ঈসা (আ.), ইহুদীরা যেমন মনে করে, ভেল্কিবাজ ও প্রতারক ছিলেন।

না বরং তিনি নেক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন যিনি স্বীয় নিদর্শন দেখানোর ক্ষেত্রে এই প্রাচীন চৌবাচ্চার কোন সাহায্য নেন নি আর বাস্তবেই নিদর্শনই দেখিয়েছেন। আর কুরআন শরীফে ঈমান আনার পর এসব কুমন্ত্রনা হতে **যদিও** পরিত্রাণ লাভ হয়ে যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি এখনও কুরআন শরীফে বিশ্বাস স্থাপন করেনি আর ইহুদী, হিন্দু বা খ্রিষ্টান সে কীকরে এমন কুমন্ত্রনা হতে মুক্তি পেতে পারে আর কী করে তার হৃদয় প্রশান্তি পেতে পারে যে, এমন অভিনব চৌবাচ্চা সত্ত্বেও যাতে সহস্র সহস্র খোড়া ও লুলা আর জন্মান্ধরা এক ডুবেই সুস্থ হয়ে যেতো আর শতশত বছর থেকে স্বীয় বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যের কল্যাণে যা ইহুদী এবং এদেশের সকল মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ এবং মানুষের ভেতর বহুল আলোচিত, অগণিত মানুষ তাতে ডুব দেয়ার কল্যাণে আরোগ্য লাভ করেছিল আর প্রতি দিনই লাভ করত। সর্বদা সেখানে মেলার মত দৃশ্য বিরাজ করত আর ঈসাও প্রায় সময় সেখানে যেতেন আর এর বিস্ময়কর সব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মসীহ এসকল নিদর্শন প্রদর্শনে যা আদি থেকে সেই চৌবাচ্চা প্রদর্শন করে আসছিল, সেই চৌবাচ্চার পানি বা মাটি হতে কোন সাহায্য নেন নি আর তাতে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে নিজের ব্যবস্থাপত্র বের করেন নি।

সুতরাং এমন ধারণা নিঃসন্দেহে প্রমাণশূণ্য কথা, যা বিরোধীদের সামনে কোন কাজের নয় আর নিঃসন্দেহে এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের চৌবাচ্চার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভাবলে হযরত ঈসার বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি বর্তায় যা কোনভাবে খণ্ডিত হতে পারে না।

এসম্পর্কে **যতই ভাবা যায়** সন্দেহ-সংশয় **ততই** বৃদ্ধি পায়, আর খ্রিষ্টানদের জন্য মুক্তির কোন পথ চোখে পড়ে না।

কেননা পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা দেখে এই সন্দেহ আরো বদ্ধমূল হয়। **মানুষের নিজেরই স্মরণশক্তি** এমন ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার অনেক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে বরং সকল মানুষ এ সকল ষড়যন্ত্র সম্পর্কে চাক্ষুষ ঘটনাবলীর একটি স্তুপ নিজের হৃদয়ে ধারণ করে। স্বয়ং এমন প্রতারণা, যা কেবল অতিসরল ও অজ্ঞদের সামনেই চলতে পারে আর যা থাকে পর্দার অন্তরালে; এমন একটি বিষয় যা প্রতারকদেরকে তাদের ষড়যন্ত্রে ধৃষ্ট করে তুলে।

সাধারণ মানুষ যাদের বেশীরভাগ পশুতুল্য হয়ে থাকে, তাদের এদিকে দৃষ্টিই থাকে না যে, দীর্ঘ কোন অনুসন্ধান করবে আর কথার গভীরে অবগাহন করবে।

আর এমন তামাশা **প্রদর্শনকাল** অতি সংক্ষিপ্ত***B*** হয়ে থাকে, যা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া সম্ভব হয় না। তাই প্রতারকদের জন্য প্রতারণামূলক দক্ষতা প্রদর্শনের অনেক সুযোগ থাকে আর তাদের অজানা রহস্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ কমই আসে।

এছাড়া সাধারণ মানুষ **প্রাকৃতিক** বিজ্ঞান, দর্শন ও **কলা শাস্ত্রেও** কিছুই জানে না আর **মূর্তিমান প্রজ্ঞা খোদা** বিশ্বজগতে বিভিন্ন প্রকার বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যাবলী সৃষ্টি করেছেন, তারা আদৌ **যার** কোন জ্ঞান রাখে না।

সুতরাং তারা সব সময় আর সকল যুগে প্রতারিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত, কেনই বা প্রতারিত হবে না? কেননা, বস্তুর বিশেষত্ব অনেক বিস্ময়কর হয়ে থাকে আর অজ্ঞতাই অধিক বিস্ময়ের কারণ হয়।

যেমন, মাছি এবং অন্য কিছু প্রাণির মাঝে এই বিশেষত্ব রয়েছে যে যদি এদের মৃত্যু এমনভাবে ঘটে যে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সন্ধিস্থল থেকে বেশী বিচ্ছিন্ন হয় না, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিজের আসল রূপ ও অবস্থায় অক্ষত থাকে এবং পচে না বরং তরতাজা থাকে আর মরার পর ২-৩ ঘন্টার বেশী সময় অতিবাহিত না হয়ে পানিতে পড়ে থাকা মৃত মাছির ন্যায় হয়ে থাকে; এমন পরিস্থিতিতে লবন মিহি করে যদি সেই মাছি ইত্যাদিকে এর নীচে পুতে ফেলা হয় আর এর উপর সে পরিমান মাটির প্রলেপ দিয়ে দেয়া হয় তাহলে সে মাছি জীবিত হয়ে উড়ে চলে যায়।

এই বৈশিষ্ট্য সর্বজনবিদিত, সুপরিচিত যা বেশীরভাগ বালকরাও জানে। কোন অতি সরলমানুষ এ ব্যবস্থাপত্র সম্পর্কে **যদি** অবহিত না থাকে আর কোন প্রতারক সেই নির্বোধের সামনে মাছির চিকিৎসক হওয়ার দাবী করে আর সেই পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে মাছিকে জীবিত করে এবং বাহ্যতঃ এটি বুঝানোর জন্য যে, সে মন্ত্রের জোরে মাছি জীবিত করছে, **আর** কোন তন্ত্র-মন্ত্র **যদি** পাঠ করতে থাকে, তাহলে অতি সরল ব্যক্তির, সে বুদ্ধি ও সময় কোথায় যে, সে গবেষণা করে বেড়াবে?

তোমরা কি দেখো না যে ধুরন্ধর প্রতারকরা এযুগে পৃথিবীকে ধ্বংস করছে। কেউ স্বর্ণ বানিয়ে দেখায় কেউ 'কিমিতি' হওয়ার দাবি করে আর কেউ নিজেই মাটির নীচে পাথর পুঁতে হিন্দুদের সামনে দেবী বের করে আনে। কতক জামাল গোটার রং নিজের দোয়াতের কালিতে মিশিয়ে তারপর সেই কালি ব্যবহার করে কোন অতি সরল ব্যক্তিকে তাবিজ লেখে দিয়েছে, যেন দাস্ত এলে তাবিজের ভেল্কি প্রকাশ পায়। এমন আরো সহস্র ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা রয়েছে, যা এযুগে প্রকাশ পাচ্ছে।

এছাড়া কিছু প্রতারণা এত গভীর যে, বড় বড় জ্ঞানীরাও এর দ্বারা প্রতারিত হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সুগভীর সূক্ষ্ম রহস্যাবলী ও শারীরবৃত্তিয় গঠন এবং শক্তি-বৃত্তির বিস্ময়কর বিশেষত্ব যা আধুনিক যুগে নুতন নুতন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত বিস্তার লাভ করে চলেছে, এসব হলো নুতন বিষয়াদি যার মাধ্যমে মিথ্যা নিদর্শন প্রদর্শনকারীরা নিত্যনুতন প্রতারণা ও ভেল্কি দেখাতে পারে।

সুতরাং এ গবেষণার মাধ্যমে এটি স্পষ্ট যে, যেসব নিদর্শন বাহ্যত এসকল ষড়যন্ত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তা সত্য হলেও এসবের বাস্তবতা পর্দাবৃত আর এর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করার পথে বড় বড় অন্তরায়**।** রয়েছে। (চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

জুমুআর খুতবা

পূণ্য কাজে পরস্পরের প্রতিযোগিতা

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৭ অক্টোবর ২০১৭'র জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মু'মিনদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সব সময় তোমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ {অর্থাৎ, পুণ্যের ক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা করা (সূরা আল্ বাকারা: ১৪৯)}। অর্থাৎ, পুণ্যে বা সৎকর্মে সর্বদা একে অন্যের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কর কেননা,সৎকর্মশীলদের আল্লাহ্ তা'লা সর্বোত্তম সৃষ্টি আখ্যা দিয়েছেন। যেমন, তিনি বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ
أُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝

(সূরা আল্ বাইয়্যেনা : ৮) অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করে তারাই সর্বোত্তম সৃষ্টি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সংক্ষেপে এক জায়গায় বলেন,"মানুষের উচিত নিজের আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করা আর সৎকর্মের ক্ষেত্রে উন্নতি করা"। (মলফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১৫, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)। তিনি (আ.) এই আয়াতের বরাতে (একথা) বলেছেন।

অতএব, সৎকর্মে এগিয়ে যাওয়া, নেক কাজ, সৎকাজ করাই একজন মুসলমান বা মু'মিনকে প্রকৃত মু'মিনের মর্যাদা দিয়ে থাকে আর এজন্য আমাদের সদা সচেষ্ট থাকা উচিত। আমাদের পথ-নির্দেশনার লক্ষ্যে কুরআন ও হাদীসের আলোকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিশদভাবে এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নেকী বা পুণ্য কী? সত্যিকার নেকী কীভাবে অর্জন করা যায়? নেকী করার জন্য খোদার সত্তায় ঈমান রাখা কেন আবশ্যক? ঈমানের মানদণ্ড কী হওয়া উচিত? ঈমানের এই মানকে কীভাবে আমাদের উন্নত করা উচিত? কী কী মাধ্যমে নেকী করা যায়? পুণ্যকর্মের কী কী দিক রয়েছে? নেকী কত প্রকার ও কী কী? এবং পুণ্যবানদের আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে পুরস্কারে

ভূষিত করেন? এছাড়া তিনি (আ.) একথাও বর্ণনা করেছেন যে, বৈধ কাজও একটি সীমার ভেতরে থেকে ভারসাম্য বজায় রেখে সম্পাদন করার নাম নেকী। এক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করলে তা পুণ্যের মাত্রাকে কম করে দেয়। অধিকন্তু একজন মু'মিনের জন্য তার নেকী বা পুণ্যের গণ্ডিকে কতটা সম্প্রসারিত করা উচিত তাও তিনি (আ.) বলেছেন। এক কথায় নেকী বা পুণ্যের মর্ম, গূঢ়তত্ত্ব এবং এর স্বরূপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে তিনি (আ.) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। এখন আমি এই সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব। প্রকৃত নেকী বা পুণ্য কী? একই সাথে বাহ্যত একটি নগণ্য পুণ্যকর্মও খোদার সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে, এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "নেকী বা পুণ্য হল ইসলাম এবং খোদার দিকে আরোহনের একটি সিঁড়ি। (ইসলামের প্রকৃত মর্ম যদি উদ্‌ঘাটন করতে হয়, খোদার সন্তুষ্টি যদি অর্জন করতে হয় এবং তাঁর নৈকট্য যদি পেতে হয় তাহলে নেকী বা পুণ্যকর্ম হল এর জন্য সোপানস্বরূপ।) কিন্তু স্মরণ রেখো! পুণ্য কাকে বলে? তিনি (আ.) বলেন, শয়তান মানুষকে সব দিক থেকে লুটেপুটে খায় আর তাদেরকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করে। যেমন রাতে যদি বেশি খাবার রান্না করা হয়, (সম্পদশালী কোন মানুষের ঘরে যদি রাতে বেশি খাবার রান্না করা হয় আর রুটি বেশি বানানো হয়ে যায়) আর রাতের বাসি খাবার সকালে রয়ে যায়, (রাতে খেয়ে শেষ করা যায় নি, বেঁচে গেছে, পরের দিন) তিনি (আ.) বলেন, ঠিক খাবারের সময় তার সামনে ভালো ভালো খাবার রাখা হয় আর তা থেকে এক গ্রাস মুখে নেয়ার পূর্বেই ভিখারী এসে দরজায় কড়া নাড়ে এবং খাবার চায়, (তখন সেই ব্যক্তি, যে কেবলই খাবার খেতে বসেছিল)বলে, বাসি রুটী ভিখারিকে দিয়ে দাও, (বিগত রাতের অতিরিক্ত যে খাবার রয়ে গেছে তা তাকে দিয়ে দাও। অথচ তার নিজের সামনে সবে রান্না করা টাটকা খাবার রাখা রয়েছে।) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,এটি কী নেকী হবে? বাসি রুটি তো পড়েই থাকত, বিলাসী ব্যক্তি তা কেন খাবে? আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٩﴾

(সূরা আদ্ দাহ্‌র: ৯) (অর্থাৎ তারা তাআ'ম এর প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও মিসকীন, এতীম ও বন্দীদের তা খাইয়ে দেয়) এটিও জানা থাকা উচিত, পছন্দনীয় খাবারকেই 'তাআ'ম' বলা হয়।(অর্থাৎ, তাআ'ম সেটি যা পছন্দনীয়)পচা ও বাসি খাবারের জন্য 'তাআ'ম' শব্দ ব্যবহৃত হয় না। (একদিনের পুরোনো খাবার যা মানুষ নিজেই পছন্দ করে না, সেই খাবারের জন্য আরবীতে 'তাআ'ম' শব্দ ব্যবহৃত হয় না।) তিনি (আ.) বলেন, বস্তুত সেই থালা যাতে এখনই তাজা, সুস্বাদু ও পছন্দনীয় খাবার রাখা হয়েছে, (তোমাদের সামনে প্লেটে রাখা খাবার যা তোমরা খাচ্ছ) খাওয়া তখনো আরম্ভ করে নি, ভিখারীর আওয়াজ শুনে তাকে যদি তা দিয়ে দেয় তাহলে এটি নেকী বা পুণ্য।"(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭৫, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

সামনে তাজা খাবার থাকা অবস্থায় কোন যাচনাকারী বা দরিদ্র মানুষ এলে তাকে যদি তা দিয়ে দাও তাহলে এটিই নেকী বা পুণ্য। আর এটি পুণ্য নয় যে, আমি টাটকা খাবার খাব আর ঘরের লোকদের বলে দিব, গতকালের বেঁচে যাওয়া খাবার তোমরা তাকে দিয়ে দাও। এতটা গভীরে গিয়ে চিন্তা করলেই মানুষ প্রকৃত পুণ্য সাধন করতে পারে। কাজেই, সত্যিকার পুণ্য করার চেষ্টা থাকা উচিত। আর নেকী বা পুণ্য কীভাবে করা সম্ভব হতে পারে, খোদার সত্তায় পূর্ণ ঈমান ছাড়া এই নেকী বা পুণ্যকর্ম করা সম্ভব নয়। এ বিষয়টি বিশদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

"সত্যিকার নেকী বা পুণ্যকর্মের জন্য আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তায় ঈমান থাকা আবশ্যক। কেননা, রূপক শাসকরা (বা পার্থিব শাসকরা) জানে না, ঘরে কে কী করে আর পর্দার অন্তরালে কার কর্ম কেমন! (খোদার সত্তায় ঈমান থাকা উচিত আর এ ঈমান থাকা উচিত যে, প্রতিটি জিনিসের ওপর খোদার দৃষ্টি রয়েছে। জাগতিক প্রশাসন বা সরকার অথবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জানে না, মানুষের ভেতরে কী আছে কিন্তু আল্লাহ্ জানেন আর এ বিশ্বাস থাকা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে সম্যক অবহিত, সবকিছুর জ্ঞান রাখেন এবং অদৃশ্যের জ্ঞানও তাঁর রয়েছে।) তিনি (আ.) বলেন, কেউ যদি মৌখিকভাবে পুণ্যের কথা বলে কিন্তু স্বীয় হৃদয়ে যা কিছু ধারণ করে এসম্পর্কে সে আমাদের শাস্তির ভয় না করে; আর পার্থিব সরকারগুলোর মাঝে এমন একটিও নেই যার ভয় মানুষের ভেতর রাতে বা দিনে, অন্ধকার বা আলোতে, নির্জনে বা জনসমক্ষে, বিরাণভূমি বা লোকালয়ে, ঘরে বা বাজারে সর্বাবস্থায় সমানভাবে বিরাজ করবে (অর্থাৎ, অনেক সময় মানুষ গোপনে কোন কাজ করে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অবস্থায় বসে থাকে, সে জানে, শুধু আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া বাহ্যত কেউ তাকে দেখছে না, যিনি সব কিছু জানেন; তাই ভয়ও থাকে না আর ভয় না থাকার কারণে সে অন্যায় কাজও করে বসে। তাই প্রকৃতই যদি পুণ্যকর্ম করতে হয় তাহলে খোদার সত্তায় ঈমান থাকা আবশ্যক।) অতএব, চারিত্রিক সংশোধনের জন্য এমন সত্তায় ঈমান থাকা আবশ্যক যিনি সর্বাবস্থায় ও সব সময় তার তত্ত্বাবধায়ক এবং তার কাজ, কর্ম ও তার হৃদয়ে লুক্কায়িত গোপন বিষয়াদির সাক্ষী।" (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১৩, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ) আর তিনি আল্লাহ্‌র সত্তা ছাড়া আর কেউ নয়। অতএব, যদি এরূপ ঈমান থাকে, এই মানের ঈমান থাকে এবং সদা খোদার কথা স্মরণ থাকে, কেবল তবেই মানুষ সত্যিকার অর্থে নেকী বা পুণ্যকর্ম করতে পারে।

এরপর সত্যিকার নেকী বা পুণ্যকর্মের সমধিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "তাকওয়ার অর্থ হল, পাপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পথগুলো এড়িয়ে চলা। কিন্তু স্মরণ রেখো! পুণ্য কেবল এতটুকুই নয় যে, এক ব্যক্তি বলবে, আমি পুণ্যবান– কারণ আমি কারো সম্পদ হরণ করি নি। (অর্থাৎ, চুরি করি নি, আত্মসাৎ করি নি, অন্যায় পথে উপার্জন করি নি, এগুলো কোন নেকী নয়।) তিনি (আ.) বলেন, (কেউ যদি বলে,)আমি সিঁধ কাটি না, চুরি করি না, কুদৃষ্টি দেই না, ব্যভিচারে লিপ্ত হই না, এমন নেকী বা পুণ্য তত্ত্বজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে হাস্যকর বিষয়। কেননা, যদি সে এসব পাপে লিপ্ত হয় এবং চুরি বা ডাকাতি করে তাহলে সে শাস্তি পাবে। তাই এটি কোন পুণ্য নয় যা তত্ত্বজ্ঞানীর দৃষ্টিতে মূল্যায়ণযোগ্য হবে। বরং সত্যিকার নেকী হল, মানব জাতির সেবা করা এবং খোদার পথে পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করা; তাঁর পথে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে দ্বিধা না করা। এজন্যই এখানে তিনি বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴿١٢٩﴾

(সূরা আন্ নাহল: ১২৯) অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাদের সাথে আছেন যারা পাপ এড়িয়ে চলে আর একই সাথে নেকী বা পুণ্যকর্মও সম্পাদন করে। এ কথা ভালোভাবে স্মরণ রেখো,

নিছক পাপবর্জন বড় কোন বিষয় নয়, (একথা বলা যে, আমি পাপ করি না তাই বড় পুণ্যবান, এটি কোন বড় বিষয় নয়,) যতক্ষণ পর্যন্ত, এর পাশাপাশি বিভিন্ন সৎকর্ম না করবে। অনেক মানুষ আছে যারা কখনো ব্যভিচার করে নি, হত্যা করে নি, চুরি করে নি, ডাকাতি করে নি আর তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার পথে কোন নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করে নি। (খোদার সন্তুষ্টির জন্য খোদার নির্দেশ অনুসারে কোন সৎকর্ম করে নি, কোন ত্যাগ স্বীকার করে নি, যদিও অন্য অনেক পাপে তারা লিপ্ত হয় নি,) তিনি (আ.) বলেন, অথবা সেই লোকটি মানব জাতির কোন সেবা করে নি। (যদি আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অধিকার না দেয় এবং বান্দার প্রাপ্যও না দেয়) আর এধরনের কোন সৎকাজ যদি না করে (নিঃসন্দেহে সে অনেক পাপে লিপ্ত হয় নি কিন্তু যদি খোদার প্রাপ্য না দেয় আর মানবসেবা না করে এবং তার প্রাপ্য অধিকার না দেয়, তাহলে এটি কোন নেকী বা পুণ্য নয়।) তিনি (আ.) বলেন, অজ্ঞ সে ব্যক্তি, যে এসব কথা উপস্থাপন করে তাকে নেক বা পুণ্যবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে, কেননা এগুলো তো পাপাচার। কেবল এতটুকু আত্মতৃপ্তি নিয়ে কেউ আল্লাহ্‌র ওলীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।" (মলফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৪১-২৪২, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

এ সম্পর্কে তিনি (আ.) আরো বলছেন,"এটি কোন গর্বের বিষয় নয় যে, মানুষ শুধু এটি নিয়েই আনন্দিত হবে যে, সে ব্যভিচার করে না বা হত্যা করে নি অথবা চুরি করে নি। এটি কি কোন শ্রেষ্ঠত্ব যে, মন্দ কাজ এড়িয়ে চলা নিয়ে গর্ব করবে? (এটি বড় কোন বিষয় নয় যে, আমি কখনো কোন পাপে লিপ্ত হই নি।) তিনি (আ.) বলেন, সত্যিকার অর্থে সে জানে, চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে আর বিদ্যমান আইনে সে কারাদণ্ড প্রাপ্ত হবে। (চুরি করে ধরা পড়লে জেল হবে, শাস্তি পাবে, তাই এটি কোন শ্রেষ্ঠত্ব নয়, এটি হল শাস্তির ভয়।) এরপর তিনি (আ.) বলেন, খোদার দৃষ্টিতে কেবল মন্দ কাজ এড়িয়ে চলাকেই ইসলাম বলে না,বরং পাপ পরিহার করে সৎকর্ম বা পুণ্য অবলম্বন না করা পর্যন্ত সে এই আধ্যাত্মিক জীবনে ধন্য হতে পারে না। (ইসলামী শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হল, নিজের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি কর এবং নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের মান উন্নত কর। শুধুমাত্র পাপ বর্জন করলেই আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে পারে না। পাপ পরিহার করে পুণ্য ও সৎকর্ম করা,আধ্যাত্মিক জীবন লাভের জন্য আবশ্যক, অন্যথায় আধ্যাত্মিক জীবন লাভ হবে না, এমন ব্যক্তি আধ্যাত্মিকভাবে মৃত।) তিনি (আ.) বলেন, নেকী খাদ্য স্বরূপ, যেভাবে কোন ব্যক্তি খাদ্য ছাড়া জীবিত থাকতে পারে না, অনুরূপভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত সৎকর্ম না করবে সবকিছুই অর্থহীন।(মলফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৭১-৩৭২, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি করলেই এ অবস্থা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমানের মান কীরূপ হওয়া উচিত? এই মান তখনই অর্জিত হবে যখন মানুষের ভেতর বাইর এক হয়ে যাবে,ঈমান যেন কেবল বাহ্যতই না থাকে। বরং মানুষ যেভাবে বিশ্বাস করে, বিষ ক্ষতিকর। (মানুষ যদি তা খায়, মারাও যেতে পারে।) যেভাবে এ বিশ্বাস রয়েছে যে, মানুষ সাপের গর্তে হাতদিলে সেই গর্তে যদি সাপ থাকে তা দংশন করতে পারে। একইভাবে খোদার সত্তায় এ বিশ্বাস থাকা চাই যে, আমি যদি পাপ করি তাহলে শাস্তি পাব, কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সব সময় দেখছেন। আর পুণ্যের প্রতিদান তো আল্লাহ্ দিয়েই থাকেন। মানুষের প্রতিটি কর্মের মাধ্যমে যেন খোদার অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সর্বদা যেন এই চেতনা বিরাজ করে যে, আল্লাহ্ আমার প্রতিটি কর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখছেন। তিনি (আ.) বলেন, সত্যিকার অর্থে সেইব্যক্তি পুণ্যবান যার ভেতর-বাইর সাদৃশ্যপূর্ণ আর যার অন্তর ও বাহির একই রকম, সে পৃথিবীতে ফিরিশ্‌তার মত বিচরণ করে। (যার ভেতর ও বাহির এক রকম আর অন্তরে যা আছে বাইরেও যদি তাই থাকে তবে এমন ব্যক্তির পুণ্যের মান এরূপ হয়ে গেছে যে, সে যেন ফিরিশ্‌তা হয়ে গেছে।) তিনি (আ.) বলেন, নাস্তিকরা এমন সরকারের অধীনস্ত নয় যে, তারা এমন উন্নত চরিত্রের অধিকারী হবে। (এক নাস্তিক, যে খোদাকে মানে না তার বাহ্যিক চরিত্র ভালো হলেও সে এই মানে পৌঁছতে পারবে না, কোন না কোন জায়গায় তার হৃদয়ে এমন ভাবের উদ্রেক হবে যার ফলে তার ভেতর দুর্বলতা সৃষ্টি হবে, হয়তো সে পাপ পরিহার করবে এবং মৌলিক কিছু চারিত্রিক গুণের ওপরও প্রতিষ্ঠিত হবে, তথাপি পুণ্যের ক্ষেত্রে তার অবস্থা দুর্বলই থেকে যাবে।) তিনি (আ.) বলেন, সমস্ত ফলাফল বা সফলতা ঈমানের ফলে প্রকাশ পায়। কেননা, জেনেশুনে কেউ সাপের গর্তে

মু'মিনদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, সব সময় তোমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ {অর্থাৎ, পুণ্যের ক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা করা (সূরা আল্ বাকারা: ১৪৯)} । অর্থাৎ, পুণ্যে বা সৎকর্মে সর্বদা একে অন্যের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কর। কেননা, সৎকর্মশীলদের আল্লাহ্ তা'লা সর্বোত্তম সৃষ্টি আখ্যা দিয়েছেন।

আঙ্গুল ঢুকায় না। যখন আমরা জানি নির্দিষ্ট মাত্রার' এস্ট্রেকনিয়া'(একটি বিষের নাম) প্রাণঘাতী বিষ, অর্থাৎ এর প্রাণঘাতী হওয়ার বিষয়ে আমরা নিশ্চিত আর এরূপ ঈমানের ফলশ্রুতিস্বরূপ আমরা সেটি খাব না আর মৃত্যুর মুখে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা পাব।" (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১৩-৩১৪, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

ঈমানের দৃঢ়তার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) আরো বলেন,"নিশ্চিত জেনে রেখো! প্রত্যেক পবিত্রতা ও পুণ্যের প্রকৃত মূল হল, আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমান আনা। আল্লাহ্‌র সত্তায় মানুষের ঈমান যতটা দূর্বল হয় সে অনুপাতেই সৎকর্মের ক্ষেত্রে তার দুর্বলতা ও উদাসীনতা পাওয়া যায়। অথচ ঈমান যদি দৃঢ় হয় আর তাঁর পূর্ণাঙ্গীণ গুণাবলীসহ খোদার সত্তায় যদি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা হয় তবে মানুষের কর্মে সে অনুপাতেই বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হয়। (মানুষ যদি বিশ্বাস রাখে, আল্লাহ্‌তা'লা সর্বশক্তির আধার, তিনি অদৃশ্যে পরিজ্ঞাত সত্তা এবং সর্বত্র আমাকে দেখছেন তাহলে এর ফলে মানুষের কর্মে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হয়, কর্মের মান নিজ থেকে বা আপনা-আপনি উন্নত হতে থাকে এবং পাপের পরিবর্তে পুণ্যের প্রতি মনোযোগ বেশি নিবদ্ধ হয়।) তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্‌র সত্তায় যে ঈমান রাখে সে পাপের ক্ষেত্রে ধৃষ্ট হতে পারে না। (এক দিকে আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমান থাকবে আর অপর দিকে পাপ করবে, এমনটি হতেই পারে না।) কেননা, এই ঈমান তার রিপুর তাড়না ও পাপের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কেটে ফেলে।

দেখ! কারো চোখ যদি উপড়ে ফেলা হয়

তাহলে সে কীভাবে কুদৃষ্টি দিতে পারে আর চোখ দিয়ে সে কীভাবে পাপ করবে? একইভাবে যদি তার হাত কেটে ফেলা হয় তাহলে এসব অঙ্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত পাপ সে কীভাবে করতে পারে? ঠিক একইভাবে যখন একজন মানুষ 'নফসে মুতমাঈন্না' বা শান্তিপ্রাপ্ত আত্মার পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন সেই শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা তাকে অন্ধ করে দেয় আর তার চোখের পাপ করার আর শক্তি থাকে না, সে দেখেও দেখে না। (কোন কিছু দেখলেও সে কুদৃষ্টিতে দেখে না) তিনি (আ.) বলেন, তার চোখের পাপ করার শক্তি যেহেতু লোপ পায়, (অর্থাৎ, লোভ ও নোংরামির চোখ অথবা কোন কিছু দেখার সময় যে নোংরা বা অবৈধ কামনা-বাসনা জাগে তা দূর হয়ে যায়) তিনি (আ.) বলেন, তাদের কান থাকা সত্ত্বেও তারা বধির হয়, পাপ-সংক্রান্ত কথা তারা শুনতে পায় না। অনুরূপভাবে, তার প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা, কামভাব এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গ কেটে ফেলা হয়। তার এমন সব শক্তি ও সামর্থ্যের মৃত্যু ঘটে, যদ্বারা পাপ হওয়া সম্ভব ছিল আর সে এক শবদেহের মত হয়ে থাকে। আর সে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার অধীনস্ত হয়ে থাকে এবং তাঁর ইচ্ছার বাইরে সে 'এক পা-ও' অগ্রসর হতে পারে না। খোদার সত্তায় পূর্ণ ঈমান থাকলে পরেই এ অবস্থা সৃষ্টি হয়। (এসব অবস্থা তখন সৃষ্টি হবে যখন আল্লাহ্‌র সত্তায় পূর্ণ ঈমান থাকবে)আর যার ফলাফল স্বরূপ তাকে পূর্ণ প্রশান্তি দেয়া হয়। এই গন্তব্যই মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত। (আমাদের টার্গেট বা লক্ষ্যও হচ্ছে এটিই)। এটিকে আমাদের দৃষ্টিতে রাখা উচিত, সকল প্রকার নোংরামিকে আমাদের মন থেকে, মাথা থেকে, চোখ থেকে এবং কান থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে আর তা শোনা থেকে দূরেও থাকতে হবে।) তিনি (আ.) বলেন, আমাদের জামা'তের জন্য এটি আবশ্যক এবং পূর্ণ প্রশান্তি লাভের জন্য পূর্ণ ঈমান থাকা অপরিহার্য। তাই আমাদের জামা'তের প্রথম দায়িত্ব হল, আল্লাহ্‌র সত্তায় পূর্ণ ঈমান লাভ করা।" (মলফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৪৪-২৪৫, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

এটি হল সেই লক্ষ্য, যা তিনি আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। প্রকৃত ঈমান লাভ হলে সৎকর্মও সম্পাদিত হবে, আর তবেই আমরা পুণ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগীদের দলভুক্ত হব এবং তখনই আমরা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হব। এরপর পুণ্যের বিভিন্ন আঙ্গিক সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "মানুষের জন্য দু'টি বিষয় আবশ্যক। একটি হল, পাপ বর্জন করা আর অন্যটি হল, পুণ্যের পানে দ্রুত ধাবিত হওয়া। আর নেকী বা পুণ্যেরও দু'টো দিক রয়েছে। একটি হল, পাপ পরিহার করা এবং দ্বিতীয়টি হল, অন্যের হিত সাধন করা। (পাপ বর্জন করা, এটি একটি পুণ্য এবং একটি দিক আর দ্বিতীয় দিকটি হল,সৎকাজ বা পুণ্যকর্ম করা।) তিনি (আ.) বলেন, শুধু পাপ বর্জন করলেই মানুষ সম্পূর্ণ হতে পারে না। (শুধু পাপ পরিহার করাই পূর্ণতা নয়, এতে ঈমানের ক্ষেত্রে দুর্বলতা থেকে যায়,) যতক্ষণ পর্যন্ত এর সাথে অন্যের হিত সাধনের বিষয়টি না থাকবে অর্থাৎ, অন্যের কল্যাণও যেন সাধন করে, (যখন পরোপকারকরে ও নেকী করে তখনই ঈমান পূর্ণতা লাভ করে।) তিনি (আ.) বলেন, এথেকে বুঝা যায়, সে কতটা পরিবর্তন সাধন করেছে আর এসব আধ্যাত্মিক মর্যাদা তখন লাভ হয়, যখন খোদার গুণাবলীর প্রতি ঈমান থাকে এবং তার যথাযথ জ্ঞান থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত এটি না হবে মানুষ পাপ মুক্ত থাকতে পারে না, অন্যের উপকার করাতো দূরের কথা (আর আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী সম্পর্কে জানার জন্য মানুষকে সব সময় কুরআন পাঠ করা অব্যাহত রাখা উচিত। এর শিক্ষাসমূহ পড়তে থাকা উচিত।) রাজা-বাদশাহ্‌দের প্রতাপ এবং ভারতীয় দণ্ডবিধিকেও মানুষ কিছুটা ভয় করে আর অনেক মানুষ এমন আছে যারা আইন ভঙ্গ করে না। তাহলে কেন তারা সুমহান বিচারক আল্লাহ্ তা'লার অবাধ্যতায় ধৃষ্ট হয়ে উঠে? এছাড়া এর অন্য আর কোন কারণ থাকতে পারে না যে, তাঁর প্রতি ঈমান নেই (ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে এজন্য এরূপ করে। নতুবা রাষ্ট্রীয় আইনকে তোমরা কেন ভয় কর?)

তিনি (আ.) বলেন, এটিই হল, সেই কারণ যার ফলে পাপ সংঘটিত হয় আর সৎকর্ম সম্পাদিত হয় না। অতএব, যেমনটি পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, দুর্বলতা তখন প্রকাশ পায় যখন ঈমানের ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকে। বিশ্বাসের দিক থেকে মানুষ আল্লাহ্ তা'লাকে সর্বজ্ঞানী, সবজান্তা এবং আলেমুল গায়েব বা অদৃশ্যে পরিজ্ঞাত সত্তা বিশ্বাস করে, কিন্তু কার্যত এর বিরোধী কাজ করে থাকে। এ কারণেই মানুষ বহুবিধ পাপে লিপ্ত হয় এবং ঈমান না থাকার কারণে অনেক নেকী বা পুণ্যকর্মের সৌভাগ্য সে পায় না। আল্লাহ্‌র সত্তায় পূর্ণ ঈমান আনয়নের পর দৈহিক পাপ থেকে বাঁচার যে মাধ্যমগুলো আছে সেগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, মোটকথা, পাপমুক্তির অভিযাত্রা সফলভাবে তখন পরিসমাপ্ত হয় যখন আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমান থাকে। এরপর দ্বিতীয় ধাপ হওয়া উচিত, আল্লাহ্‌র পুণ্যবান ও মনোনীত বান্দারা যেসব পথ অবলম্বন করেছে সেগুলোর সন্ধান করা। (প্রথমে আল্লাহ্‌র সত্তায় ঈমান এবং এরপর সেসব পথ ও পুণ্যের সন্ধান কর এবং অবলম্বন কর যেগুলো আল্লাহ্‌র পুণ্যবান বান্দা,নবী এবং পুণ্যবানরা অবলম্বন করেছেন।) যে পথ অবলম্বন করে পৃথিবীর সরলপ্রাণ ও মনোনীত যত মানুষ, আল্লাহ্‌র কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত হয়েছেন তা একই পথ। এ পথটি চেনার উপায় হল, এই বিষয়টি উদ্‌ঘাটন করা যে খোদা তাদের সাথে কী ব্যবহার করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, পাপ থেকে মুক্ত থাকার প্রথম পদক্ষেপ উত্তীর্ণ হয়, খোদার জালালী বা প্রতাপান্বিত গুণাবলীর বিকাশের মাধ্যমে অর্জিত হয়ে অর্থাৎ তিনি পাপাচারীদের শত্রু হয়ে থাকেন। (তিনি তাঁর পুণ্যবান বান্দাদের শত্রুদের ধ্বংস করেন।) আর দ্বিতীয় সোপান অতিক্রান্ত হয় খোদা তা'লার জামালী (কোমল ও দয়ার্দ্র) বিকাশের মাধ্যমে।

চূড়ান্ত কথা হল, খোদার পক্ষ থেকে যতক্ষণ শক্তি ও সামর্থ্য লাভ না হয়, ইসলামী পরিভাষায় যাকে 'রুহুল কুদুস' বলা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই সাধিত হয় না। এটি এক প্রকার শক্তি যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে লাভ হয়। এটি অবতীর্ণ হতেই হৃদয়ে এক প্রকার প্রশান্তি লাভ হয় এবং প্রকৃতিগতভাবে পুণ্যের প্রতি এক প্রগাঢ় ভালোবাসা ও প্রেমবন্ধন সৃষ্টি হয়। (খোদার জামালী বিকাশ ঘটলে একদিকে পুণ্যের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়, অপর দিকে পাপের কথা মনেই পড়ে না আর হৃদয়ে এক প্রকার প্রশান্তি সৃষ্টি হয়। এটি হল, পুণ্যবানদের কর্ম যা আমাদের জন্য আদর্শ। তিনি (আ.) বলেছেন, এগুলোর প্রতি দৃষ্টি দাও, নবীদের জীবনাদর্শ দেখ।) তিনি (আ.) বলেন, অন্য লোকেরা কঠিন ও বোঝা মনে করে যে নেকী বা পুণ্যকর্ম করে, এরা এক আত্মিক প্রশান্তি ও আনন্দের সাথে সেগুলোর প্রতি ধাবিত হয় (অর্থাৎ, যারা খোদার প্রিয়)। শিশুরা যেভাবে সুস্বাদু খাবার সাগ্রহে খেয়ে নেয়, অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক যখন স্থাপিত হয় এবং তাঁর পবিত্রাত্মা বা রূহুল কুদুস যখন তার ওপর অবতীর্ণ হয় তখন পুণ্য এক প্রকার সুস্বাদু ও সুগন্ধীযুক্ত

শরবতের মত হয়ে থাকে, আর যে সৌন্দর্য পুণ্যের মাঝে থাকে তা দৃষ্টিগোচর হওয়া শুরু হয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই পুণ্যের দিকে সে ছুটে চলে এবং পাপের চিন্তা হলেই তার হৃদয় কেঁপে উঠে। এবিষয়গুলো এমন যে, সেগুলো আমরা পুরোপুরি বর্ণনা করার জন্য ভাষা খুঁজে পাই না, (এক অদ্ভুত অবস্থা সৃষ্টি হয়, হৃদয়ে এক অদ্ভুত আনন্দ অনুভূত হয়, যাকে ভাষায় প্রকাশ করা খুব কঠিন)।

তিনি (আ.) বলেন, হৃদয়ে এ অবস্থাগুলো বিরাজ করে। (হৃদয়ই এটি অনুভব করতে পারে।) অনুভূতি সৃষ্টি হলেই বিষয়টি বুঝা যায়, তখন নিত্য নতুন জ্যোতি সে লাভ করে। মানুষের কেবল এটি নিয়েই গর্ব করলে চলবে না আর একেই নিজের উন্নতির পরমমার্গ যেন মনে না করে যে, কোন কোন সময় তার হৃদয় বিগলিত হয়। (এটি কোন বিষয় নয় যে, নামাযে কখনো কখনো কান্নাকাটি করেছ, বিগলন সৃষ্টি হয়েছে বা মন গলে গেছে, এটিকেই স্বীয় উন্নতির পরম মার্গ মনে করো না।) তিনি (আ.) বলেন, মনের এই বিগলন ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে। (বিগলনের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,) অনেক সময় মানুষ গল্প বা উপন্যাস পাঠ করে আর এর বেদনাঘন স্থানে পৌঁছে অবলীলায় কেঁদে ফেলে। (অনেক মানুষ উপন্যাস পড়তে গিয়ে যখন তাতে এমন কোন ঘটনা আসে, কেঁদে ফেলে।) অথচ সে খুব ভালোভাবে জানে, এগুলো অলীক এবং কাল্পনিক (তা সত্ত্বেও সে কাঁদে।) অতএব, কেবল কান্নাকাটি করা বা হৃদয় বিগলিত হওয়াই যদি প্রকৃত আনন্দ ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তির মূল হত তাহলে আজকের ইউরোপের (অধিবাসীদের) চেয়ে বেশি আধ্যাত্মিক স্বাদ ও আনন্দের অভিজ্ঞতা অন্য কারো থাকত না। (কেননা, এখানকার মানুষ কথায় কথায় আবেগাপ্লুত হয়ে কাঁদতে শুরু করে)। কেননা, হাজার হাজার গল্প-উপন্যাস প্রকাশিত হয় আর লক্ষকোটি মানুষ তা পড়ে কাঁদে।" (মলফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৩৮-২৪০, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)। কাহিনী পড়ে কাঁদে, নাটক দেখে কাঁদতে আরম্ভ করে দেয়। নিজেদের বা অন্যের কতক ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে। কাজেই এটি আধ্যাত্মিকতার উন্নত কোন মার্গ নয়। মানুষ যদি পাপকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলে এবং শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে পুণ্য করে তবেই তা আধ্যাত্মিক উন্নতি বিবেচিত হয়।

এরপর তিনি (আ.) নেকী বা পুণ্যের বিভাজন বা বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। প্রথমে ছিল দু'টি দিক, একটি হল শিরক বা অংশীবাদিতা পরিহার করা এবং পুণ্য করা। এখন এর আরো দু'টি দিক তুলে ধরছেন। তিনি (আ.) বলেন, মানুষ যত সৎকর্ম করে সেগুলো দু'ভাগে বিভক্ত– একটি হল ফরয বা আবশ্যিক দায়িত্ব অপরটি হল নফল বা ঐচ্ছিক দায়িত্ব। (পুণ্যের দু'টি অংশ, একটি ফরয বা আবশ্যিক নেকী আর অন্যটি নফল নেকী।) ফরযসমূহ, অর্থাৎ মানুষের জন্য যা আবশ্যিক করা হয়েছে। যেমন ঋণ পরিশোধ করা মানুষের জন্য বাধ্যতামুলক। (কারো কাছ থেকে ঋণ নিলে ঋণ পরিশোধ করা) বা কেউ আপনার প্রতি কোন পুণ্য করলে, প্রত্যুত্তরে তার সাথেও নেকী বা সদ্ব্যবহার করা (এগুলো অবশ্য কর্তব্য।) এসব আবশ্যিক দায়িত্ব ছাড়াও প্রত্যেক পুণ্যের সাথে কিছু নফলও থাকে। (যা অতিরিক্ত, তা হল নেকী) অর্থাৎ এমন পুণ্যকর্ম যা তার দায়িত্বের ঊর্ধ্বে, যেমন কেউ যদি অনুগ্রহ করে প্রত্যুত্তরে অনুগ্রহের পাশাপাশি অতিরিক্ত অনুগ্রহ করা এটি নফল। (কেউ অনুগ্রহ করেছে প্রত্যুত্তরে সেও অনুগ্রহ করেছে বরং তার চেয়ে অধিক অনুগ্রহ করেছে, এটি হল নফল।) এগুলো আবশ্যকীয় দায়িত্বের পরিশিষ্টস্বরূপ, (এর ফলে ফরয পূর্ণতা লাভ করে বা স্বীয় আবশ্যকীয় দায়িত্ব পূর্ণতা লাভ করে।) হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্‌র ওলী বা বন্ধুদের ধর্মীয় দায়িত্বের পূর্ণতা আসে নফল ইবাদতের মাধ্যমে। (তিনি (আ.) হাদীস বর্ণনা করছিলেন, এখন এর ব্যাখ্যা করছেন, আল্লাহ্‌র যারা ওলী বা বন্ধু তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পূর্ণতা পায় নফলের মাধ্যমে।) উদাহরণস্বরূপ, যাকাত দেয়ার পরও তারা বিভিন্ন সময় সদকা করে, আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের বন্ধু হয়ে যান। তাদের সাথে আল্লাহ্‌র বন্ধুত্ব এতটা ঘনিষ্ট হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি তাদের হাত, পা ইত্যাদি, (যেভাবে হাদীসে এসেছে, আমি তাদের হাত, পা ইত্যাদি)এমন কি তাদের জিহ্বা হয়ে যাই, যদ্বারা সে কথা বলে।" (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৩-১৪, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)।

ঈমানের ক্ষেত্রে মানুষ উন্নতি করার পর খোদার সত্তায় বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রেও উন্নতি করে আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সৎকাজ করে আর তখন খোদা তা'লা তাদেরকে আরো অধিক পুণ্য করার সামর্থ্য দান করেন এবং স্বীয় দানে ভূষিত করেন। সুতরাং, এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "ইসলামের জন্য খোদা তা'লার প্রাকৃতিক বিধান হল, এক পুণ্য থেকে অন্য পুণ্যের জন্ম হয়। আমার মনে আছে, তাযকিরাতুল আউলিয়া পুস্তকে আমি পড়েছিলাম, এক অগ্নি পূজারি বয়োবৃদ্ধের বয়স ছিল ৯০ বছর। দৈবক্রমে একবার লাগাতার বৃষ্টি আরম্ভ হয়, সেই বৃষ্টিতেই ঘরের ছাদে (উঠে) সে চড়ুই পাখিকে আধার খাওয়াচ্ছিল। (টানা কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হতে থাকে এসময় সে তার বাড়ির ছাদে উঠে চড়ুই পাখি বা অন্যান্য পাখিকে আধার খাওয়াচ্ছিল।) তার পাশেই কোন বুযূর্গ (মুসলমান প্রতিবেশী) ছিলেন, তিনি বলেন,এই বুড়ো! তুমি কী করছ? উত্তরে সে বলল, ভাই! ছয়-সাত দিন যাবৎ অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে, তাই চড়ুই পাখিকে আধার খাওয়াচ্ছি। তখন (সেই বুযর্গ) বলেন, তুমি বৃথাই কষ্ট করছ, (এটি পণ্ডশ্রম, এতে তোমার কোন লাভ হবে না), কেননা তুমি কাফির। তুমি আর কী প্রতিদান পাবে? (তুমি কীইবা পুরস্কার পাবে, তুমি তো অবিশ্বাসী-কাফির!) সেই বৃদ্ধ বলেন, এর পুরস্কার আমি অবশ্যই পাব। (খোদার পবিত্র সত্তায় তার বিশ্বাস ছিল। সেই ব্যক্তির ফিতরত বা প্রকৃতি নেক ছিল, এটি তার হৃদয়ের আওয়াজ ছিল যে, আমি অবশ্যই পুরস্কার পাব।) সেই বুযর্গ ব্যক্তি বলেন, আমি হজ্জে গিয়ে দূর থেকে দেখি, সেই বৃদ্ধ (যে অগ্নি পূজারি ছিল, চড়ুই পাখিকে আধার খাওয়াচ্ছিল, সে হজ্জে গিয়েছে আর ক্বাবাঘর তওয়াফ করছে।) তাকে দেখে আমি বিস্মিত হই। আমি তার দিকে এগিয়ে গেলে, (আমার কোন প্রশ্ন করার পূর্বেই) সেই ব্যক্তি বলে, পাখিকে আধার খাওয়ানো কি বৃথা গিয়েছে, এর প্রতিদান পেয়েছি কি? মুসলমান হয়ে আজ আমি হজ্জব্রত পালন করছি, চড়ুই পাখিকে আধার খাওয়ানোর ফলে আল্লাহ্ আমাকে এই পুরস্কার দিয়েছেন। অতএব, খোদা এভাবে স্বীয়দানে ভূষিত করেন। পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, চিন্তার বিষয় হল, আল্লাহ্ যেখানে এক কাফিরের পুণ্যকেও বৃথা যেতে দেন নি, সেখানে তিনি কীভাবে কোন মুসলমানের সৎকর্মকে বৃথা যেতে দিবেন? তিনি (আ.) বলেন, এক সাহাবীর কথা মনে পড়ল, তিনি নিবেদন করেন– হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি আমার কুফরী বা অবিশ্বাসের যুগে অনেক সদকা-খয়রাত করেছি, আমি কি সেগুলোর প্রতিদান পাব? (অর্থাৎ, আমি যখন কাফির ছিলাম তখন অনেক সদকা ও দান-

খয়রাত করতাম, বিভিন্ন সৎকাজ করার চেষ্টা করতাম, আমি কি সেসবের প্রতিদান পাব?) উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, সেই সদকা ও খয়রাতই তো তোমার ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছে।" সেই সদকা ও খয়রাতের প্রতিদান স্বরূপই আজকে তুমি মুসলমান হয়েছ।(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭৪-৭৫, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)।

জায়েয বা বৈধ কর্মও একটি সীমার ভেতরে থেকে করা উচিত আর এটিই নেকী– এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "পুণ্যের আরেকটি মূল হল, জাগতিক ভোগবিলাস ও চাওয়া-পাওয়া যা বৈধ, এগুলোও সীমাতিরিক্ত ভোগ করা উচিত নয়। যেমন, পানাহার করাকে আল্লাহ্ হারাম করেন নি। কিন্তু একজন মানুষ যদি দিবারাত্র নিছক পানাহারেই মত্ত থাকে আর ধর্মের ওপর একে প্রাধান্য দেয়, (তাহলে তা নিন্দনীয়) কেননা এসব জাগতিক ভোগবিলাসের উদ্দেশ্য হল, জাগতিক কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে মানুষের সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব যেন দুর্বল না হয়। (পানাহারে আল্লাহ্ তা'লা স্বাদ রাখার কারণ হল,মানুষ যেন শক্তি পায় আর খোদা প্রদত্ত আবশ্যিক দায়িত্বও যেন মানুষ পালন করতে পারে, খাওয়ার সময় এই দিকটি মাথায় রাখা উচিত, স্বাস্থ্য যেন দুর্বল না হয়।) তিনি (আ.) বলেন, এর দৃষ্টান্ত এভাবে দেয়া যায়, যেভাবে এক এক্কা গাড়ির মালিক দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়ার সময় প্রত্যেক সাত-আট ক্রোশ বা চৌদ্দ-পনের মাইল অন্তর-অন্তর ঘোড়া দুর্বলতা অনুভব করলে ঘোড়াকে সে বিশ্রাম দেয় (বিরতি দেয়) এবং নেহারী ইত্যাদি খাওয়ায় যেন ঘোড়ার সফরের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। নবীরা জগতকে যতটা উপভোগ করেছেন তা এ অর্থেই। (নবীরাও পানাহার করেন এবং পার্থিব বিভিন্ন জিনিসের মাধ্যমে আনন্দ লাভ করেন, প্রশান্তি লাভ করেন। বিয়ে-শাদী, সন্তানসন্ততি, পানাহার এবং জাগতিক বিভিন্ন জিনিস, এ সবই নবীরা ব্যবহার করেন আর জাগতকে তারা এ অর্থেই উপভোগ করেছেন।) কেননা, পৃথিবীর সংশোধনের গুরুদায়িত্ব তাদের ওপর ন্যস্ত ছিল। খোদার হাত যদি তাদের সমর্থনে না থাকত তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যেতেন।" (মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৭৪-৩৭৫, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)। (যেভাবে এক ঘোড়ার মালিক, এক্কার মালিক নিজের ঘোড়াকে সুস্থ-সবল রাখার জন্য পানাহার করায় অনুরূপভাবে নবীরাও যে ভালো জিনিস খান, পান করেন বা ব্যবহার করেন এর উদ্দেশ্য হল, পৃথিবীর সংশোধনের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা।)

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-এর কাছে কেউ আপত্তি করে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পোলাও কেন খান? আপত্তিকারী বলে, শুনেছি মির্যা সাহেব পোলাও খান, উত্তরে খলীফা আউয়াল (রা.) বলেন, আমি তো কোথাও পড়ি নি যে, ভালো খাবার খাওয়া নবীদের জন্য বৈধ নয়। এ কথা কুরআনেও পড়িনি আর হাদীসেও নয়।{রেজিষ্টার, রেওয়ায়াত সাহাবা (রা.) (অপ্রকাশিত), ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৮, রেওয়ায়েত হযরত নিযাম উদ্দীন সাহেব টেইলর (রা.)} অতএব, পোলাও খেয়ে থাকলে, হয়েছেটা কী? মানুষের মাথায় এমন আপত্তিও দানা বাঁধে। মানুষ মনে করে, তিক্ত খাবার খাওয়াই ধার্মিক হওয়ার প্রমাণ। বস্তুত এটি ভুল ধারণা। মহানবী (সা.) আমাদের সামনে যে সুন্নত বা রীতি উপস্থাপন করেছেন, সেজীবনপদ্ধতিই আমাদের অনুসরণ করা উচিত। এক সাহাবীকে তিনি (সা.) বলেছিলেন, আমি ভালো খাবারও খাই, ভালো কাপড়ও পরিধান করি, আমি বিয়েও করেছি, আমার সন্তানসন্ততিও রয়েছে, আমি ঘুমাইও আর ইবাদতও করি। তাই তোমাদের উচিত আমার সুন্নত বা রীতিঅনুসরণ করা।(বৈরুত থেকে প্রকাশিত তফসীর দূররে মনসূর , ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৩১, সূরা আল্ মায়েদার ৭৮-৮৮ নাম্বার আয়াতের ব্যাখ্যা)

যাহোক, এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এসব কাজে মত্ত হওয়া নবীদের রীতি ছিল না (অর্থাৎ, তাঁরা জাগতিক বিষয়াদি ও ভোগবিলাসে নিমগ্ন হতেন না)। নিঃসন্দেহে এটি একটি বিষ, এক পাপাচারী যাচ্ছেতাই করে এবং যা ইচ্ছে খায়, এক পুণ্যবান মানুষও যদি এমনটিই করে তাহলে খোদার পথ তাদের জন্য উন্মোচিত হয় না। (এক দুরাচারী জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে খায়, পান করে এবং জাগতিক সব কার্যকলাপ করে থাকে কিন্তু একজন পুণ্যবান মানুষ এমনটি করে না। সেও যদি এমনই করে তাহলে খোদা তা'লার বহুমাত্রিক পথ তার জন্য উন্মোচিত হবে না)। যে খোদার জন্য পদক্ষেপ নেয় খোদা অবশ্যই তাকে মূল্যায়ণ করেন। আল্লাহ্ বলেন,

اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫

(সূরা আল্ মায়েদা: ৯) অর্থাৎ,ভোগ-বিলাস ও

আমাদের পথ-নির্দেশনার লক্ষ্যে কুরআন ও হাদীসের আলোকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিশদভাবে 'পুণ্যকর্ম সাধন' বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নেকী বা পুণ্য কী? সত্যিকার নেকী কীভাবে অর্জন করা যায়? নেকী করার জন্য খোদার সত্তায় ঈমান রাখা কেন আবশ্যক? ঈমানের মানদণ্ড কী হওয়া উচিত? ঈমানের এই মানকে কীভাবে আমাদের উন্নত করা উচিত? কী কী মাধ্যমে নেকী করা যায়? পুণ্যকর্মের কী কী দিক রয়েছে? নেকী কত প্রকার ও কী কী? এবং পুণ্যবানদের আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে পুরস্কারে ভূষিত করেন?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)এর গভীর তত্ত্বপূর্ণ উদ্ধৃতিমূলে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)এর জ্ঞানগর্ভ দিকনির্দেশনা।

পানাহারের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার নাম তাকওয়া। কেবল ব্যভিচার না করা বা চুরি না করাই পাপ নয় বরং বৈধ কাজের ক্ষেত্রেও সীমালঙ্ঘন করা উচিত নয়।"(মলফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৭৫, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

বৈধ বিষয়াদির ক্ষেত্রেও ভারসাম্য বজায় রাখার নাম তাকওয়া এবং নেকী। সরকারের সাথে পুণ্য করা কাকে বলে? আর সাধারণ সম্পর্কের গণ্ডিতে এবং আত্মীয়স্বজনের বেলায় নেকী কী?– এ সংক্রান্ত স্বীয়শিক্ষা স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "আমাদের শিক্ষা হল, সবার সাথে উত্তম আচরণ কর। সত্যিকার অর্থেই সরকারের আনুগত্য করা উচিত। কেননা, তারা নিরাপত্তা দিয়ে থাকে (প্রশাসন ও সরকারের আনুগত্য করা উচিত, কেননা তারা নাগরিকের প্রতি তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে)। তিনি (আ.) বলেন, প্রাণ ও সম্পদ তাদের কারণে নিরাপদ থাকে। এছাড়া আত্মীয়স্বজনের সাথেও সদ্ব্যবহার করা উচিত, কেননা তাদেরও অধিকার রয়েছে। মোটকথা, যে ব্যক্তি মুত্তাকী নয়, বিদা'ত ও শির্‌কে লিপ্ত এবং আমাদের বিরোধী তাদের পিছনে নামায পড়া উচিত নয়। (যেখানে উত্তম আচরণ

করার তা কর, কিন্তু নেকী করার অর্থ এই নয় যে, যারা আমাদের বিরোধী, আমাদের বিরুদ্ধে ফতওয়া দেয় এবং বিদা'তে লিপ্ত তাদের পিছনে নামায পড়তে আরম্ভ করবে, এমনটি করা যাবে না)। তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু তাদের সাথে অবশ্যই সদ্ব্যবহার করা উচিত। (তারা আমাদের যত বড় বিরোধীই হোক না কেন,তাদের সাথে ভালো ব্যবহারই করতে হবে।) তিনি (আ.) বলেন, আমাদের নীতি হল, সবার সাথে নেকী বা পুণ্য কর। যে মানুষের সাথে ইহকালে পুণ্য করতে পারে না সে পরকালে কী পুরস্কার পেতে পারে? তাই সবার হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া উচিত। তবে হ্যাঁ, ধর্মীয় বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে। ডাক্তার যেভাবে সবার রোগ নির্ণয় করে সকল রোগীর চিকিৎসা করে, হোক সে হিন্দু, খ্রিষ্টান বা অন্য কেউ। অনুরূপভাবে নেকী করার ক্ষেত্রে সাধারণ রীতি দৃষ্টিগোচর রাখা চাই। কেউ যদি বলে, মহানবী (সা.)-এর যুগে কাফিরদের তো হত্যা করা হয়েছে। এর উত্তর হল, অকারণে মুসলমানদেরকে কষ্ট ও যাতনা দেয়ার মাধ্যমে হত্যা করার অপরাধে তারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। (তারা মুসলমানদের হত্যা করত, তাদের ওপর যুলম-নির্যাতন চালাত, এই অপরাধের জন্য তাদের শাস্তি দেয়া হয়েছে,) অপরাধী হিসেবে তারা শাস্তি পেয়েছে। (শুধু অস্বীকারের কারণেইতারা শাস্তি পায় নি।) তারা যদি অজান্তে অস্বীকার করত আর এর সাথে যদি দুষ্কৃতি ও নিপীড়ন না চালাত, তাহলে এ পৃথিবীতে তারা শাস্তি পেতো না।"(মলফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১৯-৩২০, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

পুণ্যের গণ্ডি কতটা বিস্তৃত করা উচিত এ সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, "স্মরণ রেখো! আমার দৃষ্টিতে সহানুভূতির গণ্ডি অনেক ব্যাপক। কোন জাতি এবং ব্যক্তিকে এর বাইরে রাখা উচিত নয়। বর্তমান যুগের অজ্ঞদের মত আমি একথা বলব না যে, তোমরা শুধু মুসলমানদের মাঝেই তোমাদের সহানুভূতিকে সীমাবদ্ধ রাখ। না, বরং আমি বলব, খোদার পুরো সৃষ্টির প্রতি তোমরা সহানুভূতিশীল হও। সে যে-ই হোক না কেন, হিন্দু হোক বা মুসলমান অথবা অন্য যে কেউ। আমি এমন লোকদের কথা কখনো পছন্দ করি না, যারা সহানুভূতিকে শুধু স্বজাতির মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখে। এদের কেউ কেউ এ ধারণাও রাখে যে, চিনির শিরাভর্তি মটকায় হাত ডুবিয়ে এরপর সেই শিরামাখা হাত তিলে অর্থাৎ তিলের বস্তায় ঢুকালে যতটুকু তিল তাতে লেগে যায়,অন্য মানুষের সাথে ততটা প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি করা বৈধ। (কোন কোন অ-আহমদীর দৃষ্টিভঙ্গী এটি। চিনির শিরা বা মধুতে হাত ডুবিয়ে বের কর, এরপর সেই ভিজা হাত তিলের স্তূপে ঢুকিয়ে দাও, যতটা তিল হাতে লাগবে ততটা ধোঁকা তুমি দিতে পার, মানুষকে ততটা ধোঁকা দেয়া এবং মানুষের অধিকার ততটা খর্ব করা বৈধ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, এটি অনেক বড় পাপ, আদৌ বৈধ নয়,) তাদের এমন অর্থহীন ও মনগড়া কথাবার্তা অনেক বড় ক্ষতি করেছে। আর এটি তাদেরকে বন্য এবং হিংস্র প্রাণীতে পরিণত করেছে। (বর্তমান যুগের মুসলমানদের অবস্থা এটিই।) কিন্তু আমি তোমাদেরকে বার বার এ নসীহত করি যে, সহানুভূতির গণ্ডিকে তোমরা কোনক্রমেই সীমাবদ্ধ করবে না বরং সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য সেই শিক্ষা অনুসরণ কর যা আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন।

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى

(সূরা আন্ নাহল: ৯১) অর্থাৎ, প্রথমত পুণ্যের ক্ষেত্রে তোমরা 'আদল' বা ন্যায়পরায়ণতাকে দৃষ্টিতে রাখ, যে তোমার সাথে পুণ্য করে তার সাথে তুমিও পুণ্য কর। এরপরের স্তর হল, তুমি এর চেয়ে বেশি পুণ্য তার প্রতি কর, এটিকে বলা হয় 'এহসান'। 'এহসান' যদিও আদলের চেয়ে উন্নত স্তর আর এটি অনেক বড় নেকী, কিন্তু এহসানকারী কোন কোন সময় খোঁটাও দিয়ে বসতে পারে, অথচ এসব কিছুর উর্ধ্বেও একটি স্তর আছে, যে স্তরে মানুষ এমনভাবে নেকী করে যা ব্যক্তিগত ভালোবাসাবশতঃ হয়ে থাকে, তাতে অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে দেয়ার বা খোঁটা দেয়ার কোন সুযোগ নাই। যেভাবে মা তার সন্তানের লালনপালন করে থাকে, আর এই লালনপালনের ক্ষেত্রে সে কোন পুরস্কার বা প্রতিদান চায় না বরং সহজাত প্রেরণা নিয়ে সন্তানের জন্য নিজের সমস্ত সুখ ও আরামকে বিসর্জন দেয়। এমনকি কোন বাদশাহ্ যদি কোন মাকে নির্দেশ দেয় যে, তুমি তোমার সন্তানকে দুধ পান করানো বন্ধ করে দাও আর এর ফলে সন্তান মারা গেলেও কোন শাস্তি তোমাকে দেয়া হবে না, তাহলে এমন নির্দেশ শুনেকী মা কখনো আনন্দিত হবে? এবং সেই নির্দেশ শিরোধার্য করবে? মোটেও না। বরং, এমন বাদশাহ্‌কে সে মনে মনে অভিশম্পাত দিবে যে, এমন নির্দেশ কেন সে দিল? অতএব, পুণ্য বা নেকী এভাবে হওয়া উচিত যা সহজাত প্রেরণার পর্যায়ে উপনীত। কেননা, কোন জিনিস যখন উন্নতি করতে করতে তার পরম মার্গে পৌঁছে যায়, তখনই তা পুর্ণতা লাভ করে।" (মলফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৮২-২৮৩, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

অতএব, পুণ্য এমন হওয়া উচিত যেন সব সময়ই পুণ্যের ধ্যান-ধারণা অন্তরে বিরাজ করে। তিনি (আ.) বলেন, সহজাত প্রেরণায় মানব জাতির প্রতি সহানুভূতির নাম হল, اِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى। পুণ্যকে এ ক্রমধারায় বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য হল, তোমরা যদি পুরোপুরি নেক বা পুণ্যবান হতে চাও, তাহলে তোমাদের পুণ্যকে اِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى অর্থাৎ সহজাত বৈশিষ্ট্যের পর্যায়ে উপনীত কর। কোন জিনিস উন্নতি করতে করতে স্বীয় প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কেন্দ্রে না পৌঁছা পর্যন্ত শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করতে পারে না।"(মলফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৮৩, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

স্মরণ রেখো! আল্লাহ্ তা'লা পুণ্য বা নেকীকে খুবই ভালোবাসেন আর তিনি চান, তাঁর সৃষ্টির প্রতি যেন সহানুভূতি প্রদর্শিত হয়। তিনি যদি পাপই পছন্দ করতেন, তাহলে পাপ করার নসীহত করতেন, কিন্তু খোদার পবিত্র মহিমা এর উর্ধ্বে, (সুবহানাহু ওয়াতায়ালা শানুহু।) (মলফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৮৪, ১৯৮৫ সনে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন আমরা যেনখোদার সন্তুষ্টির খাতিরে পুণ্য কাজ করতে পারি। আর পুণ্যের ক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার যে লক্ষ্য আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা নির্ধারণ করেছেন তা যেন আমরা অর্জন করতে সক্ষম হই।

নামাযের পর, আমি কয়েকজনের গায়েবানা জানাযা পড়াব। প্রথম জানাযা জামাতের মুরব্বী জনাব হামেদ মকসুদ আতেফ সাহেবের।তিনি প্রফেসর মাসুদ আহমদ আতেফ সাহেবের ছেলে, যিনি গত ২২ অক্টোবর কিডনি বা বৃক্ক অকেজো হয়ে যাওয়ার ফলশ্রুতিতে রাবওয়ার তাহের হার্ট ফাউন্ডেশনে ৪৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত আব্দুর রহীম দর্‌দ সাহেবের দৌহিত্র ছিলেন।

তার পিতা ছিলেন অধ্যাপক মাসুদ আহমদ আতেফ সাহেব। প্রফেসর সাহেব ১৯৫৫ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত তা'লিমুল ইসলাম কলেজে পদার্থবিদ্যা পড়ানোর সুযোগ পেয়েছেন। মকসুদ আতেফ সাহেব মাসুদ আতেফ সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি রাবওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন, এরপর জীবন উৎসর্গ করে জামেয়ায় ভর্তি হন এবং ১৯৯১ সনে শাহেদ পাশ করেন। প্রথমে তার সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু এক স্বপ্নের ভিত্তিতে তিনি কলেজে পড়া বাদ দিয়ে জামেয়ায় ভর্তি হন। সেখান থেকে শাহেদ ডিগ্রী অর্জন করে মুবাল্লিগ হন। আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় তার স্ত্রী ছাড়াও দু'কন্যা এবং এক পুত্র সন্তানরয়েছে। তার তিন সন্তানই পড়াশোনাকরছে, ছোট ছেলে ওয়াসেফ হামেদ 'মাদ্রাসাতুল হিফ্‌য'-এ কুরআনের হাফিয হচ্ছে।

মকসুদ আতেফ সাহেব ১৯৯১ সনে জামেয়া থেকে পাশ করার পর পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে তার পদায়ন হয়। এরপর ফরাসী ভাষা শেখার জন্য ইসলামাবাদের নমল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৯৭ সনের মে মাসে তাকে আইভরি কোস্টে মুবাল্লিগ হিসেবে প্রেরণ করা হয়। ২০০২ পর্যন্ত আইভরি কোস্টে কাজ করার তৌফিক পেয়েছেন, এরপর ২০১৬ পর্যন্ত বুরকিনাফাসোঁতে জামা'তের খিদমতের সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর কিডনি বা বৃক্ক রোগে আক্রান্ত হলে তাকে পাকিস্তানে ফিরিয়ে আনা হয়। তার স্ত্রী বলেন, আমি আইভরি কোস্টে যাওয়ার পর তিনি আমাকে অনেক পরিশ্রম করে ফ্রেঞ্চ ভাষা শিখিয়েছেন যেন আমার দৈনন্দিন কার্যাদি এবং মানুষের সাথে মেলামেশা সহজ হয় আর লাজনার তরবীয়তের ক্ষেত্রেও যেন তা সহায়ক প্রমাণিত হয়। তার বেশির ভাগ সাথী লিখেছেন, মুখে সব সময় হাসি লেগে থাকত, তার ভেতর কোন কৃত্রিমতা ছিল না। বুদ্ধিমান ছিলেন, রসবোধ ছিল, বড়দের এবং নিজের সঙ্গী-সাথীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এতায়াত ও আনুগত্যের প্রেরণায় তিনি সমৃদ্ধ ছিলেন এবং একজন নিঃস্বার্থ মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তানসন্ততিকে আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্য দিন এবং দৃঢ় মনোবল দান করুন, তার পুণ্য ও নেকী ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযাটি হল, তাঞ্জানিয়ার সাবেক আমীর আলী সাঈদী মূসা সাহেবের। তিনি ৩০ সেপ্টেম্বর ৬৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ১৯৫০ সনে তাঞ্জানিয়ার চিটান্ডীতে (Chitandi) তার জন্ম হয়। ১৯৮০ সনে তিনি দারুস সালাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং অর্থনীতিতে বি.এ ডিগ্রী অর্জন করেন। এরপর ১৯৮০ সনে 'এগ্রিকালচারাল ইকোনোমিক্স' বা কৃষিঅর্থনীতিতে ডিগ্রী অর্জন করেন। বিভিন্ন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে কুরআনের 'ইয়াও' (Yao) ভাষায় অনুবাদ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারী কাজের ব্যস্ততা ও অন্যান্য কাজের কারণে তিনি এতে অনেক সময় লাগিয়ে দেন। ফলে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে বলেন, এই গতিতে অনুবাদ করলে অন্তত ত্রিশ বছর লেগে যাবে। একই সাথে তিনি গভীরউদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করেন। যাহোক, হুযূরের এই উক্তিতে আলী সাঈদী সাহেব খুবইআবেগাপ্লুত হন এবং অঙ্গীকার করেন, আমি খুব দ্রুত কুরআনের অনুবাদের কাজ শেষ করব। সে অনুসারে নিজের সব কাজ বাদ দিয়ে কুরআন অনুবাদের প্রতি পূর্ণমনোযোগ নিবদ্ধ করেন এবং পাঁচ বছরে অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করেন। ২০০৬ সনে তাকে তাঞ্জানিয়া জামা'তের আমীর নিযুক্ত করা হয়। এছাড়া বুরুণ্ডি, মোযাম্বিক এবং মালাভী জামা'তও তার তত্ত্বাবধানে ছিল। তার এমারতের যুগে জামা'ত সেখানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করে এবং বিশাল আয়তনের একটি জমিও জামা'ত ক্রয় করে। তিনি খুবই নিষ্ঠাবান, নিবেদিতপ্রাণ, বিশ্বস্ত ও পুণ্যবান একজন মানুষ ছিলেন, খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। তিনি স্ত্রী ছাড়াও তিন কন্যা এবং তিনজন পুত্র সন্তান স্মৃতিচিহ্নরূপে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে তার সৎকর্মসমূহ্ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

তৃতীয় জানাযা শ্রদ্ধেয়া নুসরত বেগম সাদেকা সাহেবার। যিনি ইদানীং রাবওয়ায় বসবাস করছিলেন। ১৬ ও ১৭ অক্টোবরের মধ্যবর্তী রাতে তাহের হার্ট ইনস্টিটিউটে তিনি ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি জনাব মু'মিন তাহের সাহেবের মাতা ছিলেন, যিনি আমাদের আরবী ডেস্কের ইনচার্জ। তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, একত্ববাদের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা এবং শির্ক ও বিদাতের প্রতি চরম ঘৃণা। খোদা-নির্ভরতা, গরীবের লালন, নিজের পুণ্য গোপন করা এবং পরম বিনয় ও নম্রতা ছিল তার অনন্য বৈশিষ্ট্য। তার দাদা হযরত মিয়াঁ আতাউল্লাহ্ সাহেব সাহাবী ছিলেন। মওলানা বুরহান উদ্দীন সাহেবের অনুপ্রেরণায় তিনি কাদিয়ান গিয়ে বয়আত করেছিলেন। পবিত্র কুরআন পড়ানোর প্রতি তাঁর সুগভীর আগ্রহ ছিল। সঠিকভাবে পড়ার এবং পড়ানোর আগ্রহ ছিল।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যখন এই আহ্বান করেন যে, নিরক্ষর বয়স্কা মহিলাদেরও কুরআন শেখার চেষ্টা করা উচিত, তখন ৭০ বছর বয়সের অনেক অক্ষর-জ্ঞানহীন মহিলাও তার কাছে এসে কুরআন পড়া শিখেছেন বরং অনেকে অনুবাদও শিখেছেন। অ-আহমদী মহিলা ও মেয়েরাও তার কাছে কুরআন পড়ত। অনেক অল্প বয়স্কা মেয়েরা লাজনার সিলেবাসের বই পড়ে তার কাছে লেখাপড়া শিখেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই পড়ার প্রতি তার গভীর আগ্রহ ছিল, অনেক নযম তার মুখস্থ ছিল এবং কালামে মাহমুদ, দুররে আদন, দুররে সমীন ইত্যাদির অনেক পঙতি তার কণ্ঠস্থ ছিল। তার ছেলে লিখেন, প্রায়ই তিনি 'মাহমুদ কী আমীন' নযমটি গভীর বেদনার সাথে পড়তেন এবং চোখে অশ্রু-বন্যা বয়ে যেত। একইভাবে বিদা'তের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর নিজ গ্রামে অনেক কাজ করেছেন। দুর্বল ঈমানের মহিলারা যারা যাদু-টোনায় অভ্যস্ত ছিল বা যারা যাদু-টোনা করাত তাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ জিহাদ করে তাদেরকে তিনি এই অভ্যাসমুক্ত করেছেন আর প্রকৃত মু'মিন মহিলায় পরিণত হওয়ার প্রতি তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছেন। গভীর বেদনার সাথে বিগলিত চিত্তে নামায পড়তেন এবং রীতিমত কুরআন তিলাওয়াত করতেন। মরহুমা ওসীয়্যত করেছিলেন। মরহুমার ছয়জন পুত্র সন্তানের মধ্যে চারজন জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি যেমনটি বলেছি, তাদের একজন হলেন মু'মিন সাহেব। অন্যরাও জামাতের সেবা করছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সকল সন্তানসন্ততিকে তার পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দিন। (আমীন)

(সূত্র: আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৭-২৩ নভেম্বর ২০১৭, খণ্ড:২৪, সংখ্যা: ৪৬, পৃ. ৫-৯)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)

বিশ্বশান্তি: সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(২৭তম কিস্তি)

অর্থনৈতিক শান্তি

(১) পুঁজিবাদ, সাম্যবাদ ও ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন।
(২) পুঁজিবাদ।
(৩) বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ।
(৪) ইসলামী ধারণা (কন্‌সেপ্ট)।
(৫) পুঁজিবাদী সমাজের চারটি বৈশিষ্ট্য।
(৬) পুঁজিবাদের চূড়ান্ত পরিণতি ধ্বংস।
(৭) পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।
(৮) ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।
(৯) যাকাত।
(১০) সুদের নিষিদ্ধকরণ।
(১১) বৃটেনের সুদের উচ্চ হার।
(১২) সুদের অন্যান্য ক্ষতিকর দিক।
(১৩) সুদ: শান্তির প্রতি এক হুমকী।
(১৪) সম্পদ মজুদ করা নিষেধ।
(১৫) সাদাসিধে জীবন যাপন।
(১৬) বিয়েশাদীতে ব্যয়।
(১৭) গরীবের দাওয়াত গ্রহণ।
(১৮) পরিমিত খাদ্যাভ্যাস।
(১৯) টাকা-পয়সা ধার করা।
(২০) অর্থনৈতিক শ্রেণী পার্থক্য।
(২১) ইসলামের উত্তরাধিকার আইন।
(২২) ঘুষ নিষিদ্ধ।
(২৩) বাণিজ্যিক নীতিমালা।
(২৪) মৌলিক চাহিদা।
(২৫) অর্থনৈতিক ঐক্যের মাধ্যম হিসেবে ইবাদত বা উপাসনা।
(২৬) আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব।

"আল্লাহ্ সুদকে বিলুপ্ত করবেন এবং দানকে বৃদ্ধি করবেন। এবং আল্লাহ্ কোন কাফের, পাপীকে আদৌ ভালবাসেন না।" (আল্ বাকারা, ২:২৭৭)

"না, বরং তোমরা এতিমকে সম্মান করো না; এবং মিসকীনকে আহার দানে পরস্পরকে উৎসাহ দাও না; এবং তোমরা গরীবের ওয়ারিশী সম্পদ অবাধে ভক্ষণ কর; এবং তোমরা সম্পদকে অত্যধিক ভালবাস।" (আল্ ফজর- ৮৯ঃ ১৮-২১)

পুঁজিবাদ, সাম্যবাদ ও ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নাতো পুঁজিবাদের অন্তর্ভুক্ত, না বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের। ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন যান্ত্রিক না হয়েও বৈজ্ঞানিক। এই দর্শন কঠোর বাধ্যবাধকতা ছাড়াই সুশৃংখল। এতে ব্যক্তিমালিকানা এবং ব্যক্তি উদ্যোগের অনুমতি রয়েছে বটে, কিন্তু এতে লিপ্সা বৃদ্ধির সুযোগ নেই। স্বল্প সংখ্যক মানুষের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ারও সুযোগ নেই, যাতে সমাজের বিরাট অংশটাই নিঃস্ব হয়ে যায়, এবং নির্মম ও নির্বাধ একটা শোষণ পদ্ধতিতে পড়ে ভূমিদাস ও ক্রীতদাসে পরিণত হয়।

পুঁজিবাদ

পুঁজিবাদে পুঁজির ওপরে সুদ প্রদান করা হয়। নীতিগতভাবে এটা এমনিতেই স্বীকৃত যে, পুঁজির বৃদ্ধিলাভের অধিকার আছে। পুঁজি সংগ্রহের ক্ষেত্রে সুদ কেন্দ্রীয় চালিকাশক্তি (motive force) হিসেবে কাজ করে। অতঃপর সুদকে শক্তি (energy) হিসেবে প্রবাহিত করে দেওয়া হয় উৎপাদনের সংযোজন প্রক্রিয়া অর্থাৎ এসেমব্লী লাইনকে সঠিক ও সচল রাখা, সংক্ষেপে, সুদ হচ্ছে পুঁজির সরবরাহ অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে একটা উদ্দীপক (incentive) শক্তি।

বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পুঁজির আবর্তন ও পুনরাবর্তনে সুদ উদ্দীপক হিসেবে কোন ভূমিকা পালন করে না; কিন্তু এক্ষেত্রে পুঁজির একচেটিয়া মালিকানা রাষ্ট্রের হাতেই ন্যস্ত থাকে। সুতরাং অনুরূপ উদ্দীপ্তকরণের আবশ্যকতা এক্ষেত্রে নেই।

অবাধ ব্যক্তি উদ্যোগের ক্ষেত্রে, সুদ দেওয়া বা নেওয়াটা বড় কথা নয়, এক্ষেত্রে যথাসম্ভব দ্রুত হারে পুঁজিকে বাড়ানোর জন্য ব্যক্তির ব্যক্তি- মালিকানার প্রেরণাই যথেষ্ট। কাউকে যদি কর্জ নেওয়া টাকার ওপরে সুদ দিতে হয়, তাহলে সেই সুদের হার 'বেঞ্চমার্ক' হিসেবে কাজ করে। এটা এমন একটা জানালা যার মধ্য দিয়ে পুঁজির তুলনামূলক বৃদ্ধি অথবা কম্‌তির মনিটর করা যায়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অবশ্য, এ ধরণের কোন প্রবণতা নেই। কেননা, এই ব্যবস্থায় পুঁজি নিয়োগ করে যারা তারা এর মালিক নয়। এতে তুলনা করার এমন কোন পদ্ধতিও নেই যদ্বারা কারও পক্ষে এটা বিচার করা সম্ভব যে, প্রবৃদ্ধির হার অর্থনৈতিকভাবে পর্যাপ্ত কিনা।

সমাজবাদী বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায়, স্বয়ং রাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্রের সমুদয় পুঁজি জবরদস্তি দখলে নেওয়ার কারণে, সুদ প্রথা সম্পূর্ণরূপে অপ্রাসঙ্গিক ও অর্থহীন হয়ে পড়ে। এখানে গোঁজামিলটা হচ্ছে, যখন কেউ প্রদেয় সুদের চাইতে অধিক উপার্জন করার জন্য কোনও চাপের মধ্যে থাকে না, তখন তার যেমন কোন প্রেরণা থাকে না, তেমনি দায়িত্ববোধও থাকে না।

ধরুন, কোন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের সরবরাহে থাকা সমুদয় পুঁজির মূল্য যদি নিরূপণ করা যেত এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, এই সমুদয় পুঁজি যদি ব্যাংকে জমা থাকতো তাহলে কি পরিমাণ সুদ পাওয়া যেত; তাহলে তা থেকে, ছবিটার একটা দিক আমাদের সামনে আসতে পারতো আর ছবিটার অপরদিকটাও আমরা সেক্ষেত্রে পেতাম লাভ ও লোকসানের ভিত্তিতে আর্থিক অবস্থাটার পরিমাপ করে। এতে অবশ্য নানা জটিলতাও সৃষ্টি হতে পারে; যেমন মঞ্জুরী নির্ধারণ করা ইত্যাদি। কিন্তু অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা যদি এ ব্যাপারে খানিকটা চিন্তা-ভাবনা করেন তাহলে এই জাতীয় বাধা বা জটিলতাও কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে এবং এতদুভয়ের তুলনার ফলে বহু উৎসাহব্যঞ্জক সম্ভাবনা সূচিত হবে।

এটা খুবই সম্ভব যে, জীবনধারণের মান পড়ে যাওয়ার পিছনে যে প্রকৃত অপরাধী তাকে এই উপায়েই চিহ্নিত করা যাবে। এমনকি, এই ধরণের বিরাট প্রচেষ্টা ছাড়াও অনুরূপ মান পড়ে যাওয়ার কারণগুলো খুঁজে বের করাটা কারো পক্ষে খুব একটা কঠিন ব্যাপার হবে না। আমি বিশ্বাস করি, যখন রাষ্ট্রও পুঁজিবাদী হয়ে ওঠে তখন যে পদ্ধতিতে সে (রাষ্ট্র) রাষ্ট্রীয় পুঁজি ব্যবহার করে তার ব্যর্থতা, তার নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পদ এবং তার ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার জন্য যে মনিটরিং পদ্ধতির প্রয়োজন তা থেকে সে বঞ্চিত থাকে। কেননা, তার কোন আর্থিক দায়-দায়িত্ব পূরণের বাধ্যবাধকতা থাকে না, এবং তা কোন প্রকার জবাবদিহি ছাড়াই যত খুশী পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারে। এই যে অবস্থাটা, এর অভ্যন্তরেই নিহিত থাকে এর সমূহ বিপদ। ব্যক্তিগত প্রেরণার অভাবে এবং বিনিয়োগকৃত মূলধন থেকে আসা লাভ ও ক্ষতি সম্পর্কে সতর্কীকরণ পদ্ধতির অভাবে উৎপাদনের উপকরণ এবং উৎপাদিত পণ্য ধ্বংস হয়। যন্ত্রপাতি ও মালামাল, সবকিছুর নষ্ট হওয়ার পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তাছাড়া, এই ব্যবস্থায় পুঁজির প্রবাহের ওপরেও কোন বাধা নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, সমাজবাদী সরকারগুলোর সামনে এমন কোন আয়না নেই যার মধ্য দিয়ে তাদের আর্থিক প্রবৃদ্ধির সঠিক হার লক্ষ্য করা সম্ভব এবং তার সঙ্গে বহির্বিশ্বের মুক্তবাজার নীতি তুলনা করা সম্ভব। একটা বাড়তি সমস্যা হচ্ছে, কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর প্রতিরক্ষা খাতে অনেক বেশী ব্যয় বরাদ্দের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া, গোয়েন্দাগিরি এবং দেশের অভ্যন্তরে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী গোষ্ঠীগুলোর জন্যেও এদেরকে বেশী খরচ করতে হয়। এর দরুন, অন্য সব কিছুতে সমতা যদি থাকেও, তবু প্রতিরক্ষা খাতে এবং আইন-শৃংখলা খাতে খরচের মাত্রা অনেক বেশী বেড়ে যায়। এই সব কারণে এবং অনুরুপ অন্যান্য কারণেও, অর্থনীতির ওপরে একটা মারাত্মক চাপের সৃষ্টি হয়। ফলে, অর্থনীতির চূড়ান্ত পতন কিছুদিনের জন্য ঠেকানো গেলেও, তা সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না।

ইসলামী ধারণা (কনসেপ্ট)

কম্যুনিজম যেক্ষেত্রে, সুদ বিলোপ করা সত্ত্বেও সম্পদের উৎপাদনে সরাসরি বিনিয়োগের জন্য প্রেরণার (incentive) কোন সুযোগ দেয় না, ইসলাম সেক্ষেত্রে অনুরূপ প্রেরণার সুযোগ দান করে। ইসলাম সুদের ব্যবসায় এবং সুদ নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও, অনুরূপ অবস্থায় কম্যুনিষ্ট দুনিয়া এ সম্পর্কিত যে সকল সুনির্দিষ্ট সমস্যাবলী প্রত্যক্ষ করে থাকে, তা ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অনুপস্থিত। সুদের অবর্তমানে, অনুৎপাদনশীল খাত হতে পুঁজি সরায়ে নিয়েও ইসলাম ব্যবহৃত (idle) মূলধন সঞ্চয়ে বাধা দান করে। এবং এই বাধাটা হচ্ছে এক প্রকার 'ট্যাক্স' যাকে বলা হয় 'যাকাত'। এই যাকাত আয় বা মুনাফার ওপরে ধার্য করা হয় না, ধার্য করা হয় খোদ পুঁজির ওপরেই।

পার্থক্যটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজি সঞ্চিত হয় মাত্র কতিপয় পুঁজিপতির হাতে এবং তারা লালসার বশবর্তী হয়ে পুঁজি বাড়াতে থাকে। এটা তারা করে সুদ জমায়ে এবং সেই সুদ আর্থিক খাতে পুনঃপ্রয়োগ করে, উদ্দেশ্য চলতি সুদের হারের চাইতে অধিক হারে মুনাফা অর্জন করা। এই পদ্ধতি ব্যর্থ হলে, আর্থিক অবস্থার পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। ইসলামী পদ্ধতিতে, পরে-থাকা (অব্যবহৃত) মূলধন হতে যাকাত দিতে দিতে ক্রমান্বয়ে শেষ হয়ে যাবে, এই ভয়ে লোকেরা বাড়তি সঞ্চয়কে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করবে এবং তাতে যাকাত দেওয়ার জন্য যে চাপ সৃষ্টি হয় তাও পাল্টে যাবে।

ইসলামের মতে, আজকের দুনিয়ার অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধান না বৈজ্ঞানিক সমাজবাদে পাওয়া যাবে, না পুঁজিবাদে। এই বিষয়টার ওপরে বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র এটা নয়। কিন্তু, তবু পুঁজিবাদ কর্তৃক যে অর্থনৈতিক অসমতা বা ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়েছে, তার দিকে তাকিয়ে আমাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য কিছুটা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

পুঁজিবাদী সমাজের চারটি বৈশিষ্ট্য

এইরূপ (অর্থনৈতিক) ভারসাম্যহীনভাব যে সমাজে সৃষ্টি হয়েছে, তাকে সনাক্ত করার ফলক-চিহ্ন কুরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতগুলিতে সুস্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে:

"না, বরং তোমরা এতীমকে সম্মান কর না এবং মিসকিনকে আহার দানে পরস্পরকে উৎসাহ দাও না এবং তোমরা (অন্যদের) ওয়ারিশী-সম্পদ অবাধে ভক্ষণ করে থাক এবং তোমরা ধনসম্পদ অত্যধিক ভালবাস।" (আল ফাজর, ৮৯:১৮-২১

সংক্ষেপে বিষয়গুলো হচ্ছে:

(১) এতীমের প্রতি অমর্যাদাকর আচরণ করা।
(২) দরিদ্রদের খাদ্য-সংস্থান বৃদ্ধি না করা।
(৩) অন্যের উত্তরাধিকার হরণ করা।
(৪) সীমাহীনভাবে সম্পদ সঞ্চয় করা।

পুঁজিবাদের চূড়ান্ত পরিণতি ধ্বংস

বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের দর্শনকে সমর্থন না করেও ইসলাম পুঁজিবাদের কিছু কিছু বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করে, কারণ:

"আধিক্য লাভের পরস্পর প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে (আল্লাহ্ থেকে) উদাসীন করে দেয় যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা কবরে পৌঁছ, অচিরেই তোমরা (সত্যকে) জানতে পারবে।" (আত্ তাকাসুর, ১০২:২-৪)

(চলবে)

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-৮১)

বিভ্রান্তিমূলক অপ-প্রচার বন্ধের জন্য আহ্বান (৮)

প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী কখন আসবেন এই প্রশ্নের উত্তরে দাবীকারকের সত্যতার সাক্ষ্য-প্রমাণগুলো সময়-কালের (Timing of Manifestation of Signs) দৃষ্টিকোণ থেকে পূণরায় বিচার-বিশ্লেষনের জন্য সত্য-সন্ধানীদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

ষষ্ঠ প্রমাণঃ আখেরী যুগে প্রকাশিত সনাক্তকারী বিশেষ চিহ্নাবলী এবং লক্ষণসমূহের সময়-কালের তাৎপর্য।

মানব সভ্যতার বিশেষ যুগ-সন্ধিক্ষণে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহের অভূতপূর্ব অগ্রগতি এবং অপব্যবহার মূলক দৃষ্টান্ত দ্বারা ঐশী-প্রতিশ্রুতিতে বর্ণিত বিভিন্ন লক্ষণ ও চিহ্নাবলী প্রকাশিত হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো কতকগুলো চিহ্নাবলী প্রকাশিত হওয়ার সময়কাল প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদীর দাবীর বাস্তব সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে সত্যায়িত। (Timing of his Advent)।

আখেরী যুগের নিদর্শনাবলী এবং লক্ষণ সমূহের পূর্ণতার সাক্ষ্য যা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরায় (আর-রহমান, তাকভীর, এবং অন্যান্য সূরা) ও হাদীসে বর্ণিত নিদর্শন সমুহ এই যুগেরই ঘটনাবলী দ্বারা সত্যায়িত হয়েছে। যেমন পানামা এবং সুয়েজ খাল, বাষ্প ও বিদ্যুত চালিত ইঞ্জিন এবং যন্ত্রপাতি, টেলিফোন, উড়োজাহাজ, নতুন নতুন যানবাহন আবিষ্কার, আকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ, পরমাণু শক্তির আবিষ্কার ইত্যাদি বর্তমান যুগেই হয়েছে।

প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.) আখেরী যুগের সনাক্তকারী ঘটনা এবং চিহ্নাবলী সম্পর্কে বলেছেন:

* "পবিত্র কুরআন আখেরী জামানার আরও অনেক চিহ্ন বর্ণনা করেছে, যখন সকল মানুষকে এক ধর্মে একত্র করা হবে। যেমন নদীসমূহকে খাল কেটে বিদীর্ণ করা হবে, পৃথিবী তার গুপ্ত খনিজ সম্পদ উন্মুক্ত করে দিবে, বিজ্ঞানের নানা প্রকার আবিষ্কার হবে, ছাপাখানা আবিষ্কারের ফলে পুস্তকাদির ব্যাপক প্রসার হবে, এমন যানবাহন আবিষ্কার হবে যা উষ্ট্রকে বেকার করবে এবং মানুষের যাতায়াতের পথ সুগম হবে। যোগাযোগের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও মাধ্যম আবিষ্কারের ফলে জনমন্ডলীর ভিতর সংযোগ সহজ হবে এবং এও বলা হয়েছে যে, একই রমযান মাসের নির্ধারিত দিনসমূহে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সংঘটিত হবে।" (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা –নামক পুস্তক)।

* "বর্তমানে আমরা দেখছি যে, জগৎ ক্রমশই এই অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পর্ক দ্রুত সুদৃঢ় হচ্ছে। ভ্রমণের সকল প্রকার ব্যবস্থা অত্যন্ত সহজ হয়েছে এবং দূর–দূরান্তরের দেশসমূহের সাথে মত বিনিময় খুবই সহজ হয়েছে। পত্র যোগাযোগ সহজ হবার জন্য বিভিন্ন জাতির ভিতর সংযোগ সাধন সম্ভব হয়েছে।" (রিভিউ অফ রিলিজিয়নস, তাং ৬-২-১৯০৩)।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দ্বিতীয় খলিফা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেছেন:

* "শেষ জামানা সম্পর্কে কুরআনে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী আছে যার কিছু ইতিমধ্যে পূর্ণ হয়েছে। যেমন একস্থানে বর্ণিত হয়েছে, "তিনি দুই সমুদ্রকে এমনভাবে প্রবাহিত করেছেন যে (এক সময়) উভয়ে মিলিত হবে। বর্তমানে উভয়ের মধ্যে এক প্রতিবন্ধক আছে, (যার দরুন) তারা একে অপরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না।... উভয় (সমুদ্র) হ'তে মুক্তা ও প্রবাল বহির্গত হয়। ... এবং সমুদ্র বক্ষে পর্বতের ন্যায় সুউচ্চ দ্রুতগামী জাহাজগুলিও তাঁরই।' (৫৫:২০-২১,২৩,২৫)।

এই আয়াতগুলিতে বর্ণিত হয়েছে দু'টি সমুদ্র যা হতে মুক্তা ও প্রবাল উত্তোলিত হয় এবং যা বিচ্ছিন্ন আছে, এক সময় এরা একত্র হবে এবং এর ভিতর দিয়ে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন জলযানসমূহ যাতায়াত করবে। সুয়েজ ও পানামা খাল খননের মাধ্যমে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। এই খাল দু'টি দ্বারা যে সাগরসমূহ একত্র করা হয়েছে তা মুক্তা সংগ্রহ ও প্রবালের জন্য বিখ্যাত।" (ইনট্রোডাকশন টু দি স্টাডি অফ হোলি কুরআন)।

৭ম প্রমাণঃ ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতার যুগে ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) আগমন করেছেন।

ইয়াজুজ-মাজুজের মহা-ধ্বংসাত্মক কর্ম-কান্ডের যুগ-সন্ধিক্ষনে যুদ্ধ–মহাযুদ্ধের মত অভূতপূর্ব ঘটনাবলীর বাস্তব দৃষ্টান্ত দ্বারা

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দী এবং তৎপরবর্তী সময়-কালে ঐশী প্রতিশ্রুত মহা–সংস্কারক রূপে মহান আল্লাহ তা'লার চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী সতর্ককারীর আগমন অপরিহার্য ছিল। পবিত্র কুরআনের সুরা আম্বিয়া: ৯৭ এবং সুরা কাহফ: ৯৫-৯৯ আয়াতে ইয়াজুজ-মাজুজের কথা বলা হয়েছে এবং বিভিন্ন হাদীসে এ সম্পর্কে যে সকল লক্ষণ ও চিহ্নাবলী বর্ণিত হয়েছে সেগুলো বর্তমান যুগে প্রকাশিত হয়েছে এবং হয়ে চলছে। ইয়াজুজ ও মাজুজ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ বর্তমান যুগের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ইয়াজুজ-মাজুজ শব্দ দুটি দ্বারা আরবীতে মূলতঃ আগুনকে বুঝায় এবং আগুন, আগ্নেয়াস্ত্র, বিদুৎ, পরমাণু অস্ত্রের শক্তির ব্যবহার এবং অপ-ব্যবহার এই যুগেই সবচেয়ে বেশী পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘটনা এবং ভবিষ্যতে তৃতীয় মহাযুদ্ধের আশংকা-এই অবস্থা থেকে বিশ্ববাসীকে উদ্ধার করার জন্য সতর্ককারী হিসেবে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তা'লা তাঁকে বলেছেন: **"দুনিয়ামেঁ এক নজির আয়া"** অর্থাৎ পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছে। আল্লাহ তা'লা কখনোই সতর্ককারী প্রেরণ না করে আযাব দেন না, (সূরা বনী ইস্রাইল: ১৬)।

বস্তুতঃপক্ষে ইয়াজুজ-মাজুজ হলো বর্তমান কালের দুটি রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি-জোট, যারা পরস্পর মারাত্মক প্রতিযোগিতা এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত রয়েছে। এই ফেতনারই আরেকটি দিক হলো ত্রিত্ববাদী খৃষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস যা দাজ্জালী ফেতনা রূপে বিশ্বের চতুর্দিকে বর্তমান কালেই সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করেছে। বস্তুতঃ সামরিক ও রাজনৈতিক বিপদাবলী (ইয়াজুজ-মাজুজের ফিতনা) এবং ধর্মীয় ও নৈতিক সমস্যাবলী তথা ত্রিত্ববাদী খৃষ্ট-ধর্মের মহা বিস্তৃতি (দাজ্জালী ফিতনা) এই উভয় দিক হতেই আজ পৃথিবীতে মহা-সংকটাপন্ন অবস্থা বিরাজমান।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেছেন:

* "আমি এটাও প্রমাণিত ও সাব্যস্ত করেছি যে, ইয়াজুজ-মাজুজের যামানাতেই মসিহ মাওউদের আবির্ভাব হওয়া জরুরী। যেহেতু আগুনকেই 'আজীজ' বলা হয়, যা থেকে ইয়াজুজ ও মাজুজ শব্দের উৎপত্তি, সেহেতু যেভাবে আল্লাহ আমাকে বুঝিয়েছেন, ইয়াজুজ-মাজুজ হলো সেই সব জাতি যারা পৃথিবীতে আগুন দ্বারা কাজ করতেই ওস্তাদ...। বাস্তব ঘটনা তো প্রমাণই করছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজ ও দাজ্জালের যে বৈশিষ্ট্য তা সর্বাধিকভাবেই ইউরোপীয় জাতিগুলোর মধ্যেই বিদ্যমান। কেননা, ইয়াজুজ-মাজুজের বর্ণনায় হাদীসে একথাও বলা আছে যে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধে মোকাবেলার শক্তি কারও হবে না, এবং মসিহ মাওউদও শুধু দোয়ার দ্বারাই কার্য সমাধা করবেন। তাদের এই বৈশিষ্ট্যের কথা কুরআন শরীফেও পরিষ্কার বর্ণনা করা হয়েছে– বলা হয়েছে: অবশেষে ইয়াজুজ ও মাজুজকে যখন ছেড়ে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচু জায়গা থেকে ছুটে চলে আসবে।" (সূরা আল আম্বিয়া ২১:৯৭)। আর দাজ্জাল সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে যে, সে দাজ্জাল (মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা) দ্বারা কার্য সম্পাদন করবে, ধর্মের আড়ালে দুনিয়ার বুকে ফিৎনা ছড়াবে। আর কুরআন শরীফে তো এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হিসেবে বলা হয়েছে ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান পাদ্রীদেরকে। এই আলোচনা থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, এই তিন (দাজ্জাল, ইয়াজুজ-মাজুজ, খৃষ্টান পাদ্রী) একই।" (চশমায়ে মারেফাত, পৃ: ৭৭-৭৯)।

* "ইয়া'জুজ-মা'জুজের সময়ে প্রতিশ্রুত মসীহর আবির্ভূত হওয়া আবশ্যক। "আজিজ" আগুনকে বলা হয় যা থেকে ইয়া'জুজ-মা'জুজ শব্দের উদ্ভব। অতএব খোদাতা'লা আমাকে বুঝিয়েছেন যে, ইয়া'জুজ-মা'জুজ সেই জাতি যারা পৃথিবীর অন্যান্য সকল জাতির আগুনের প্রায়োগিক শিক্ষাগুরু বরং আবিষ্কারক স্বরূপ। এই নামগুলোতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাদের জাহাজ, রেলগাড়ী ও যন্ত্রগুলো আগুন দ্বারা চালিত এবং তাদের যুদ্ধও আগুন দিয়ে হবে, তারা আগুন থেকে কাজ নেয়ার দুনিয়ার সকল জাতি হতে দক্ষ হবে। এই জন্য তারা ইয়া'জুজ-মা'জুজ বলে অভিহিত হবে।... সুতরাং ইয়া'জুজ-মা'জুজের যুগে মসীহ মাওউদের আবির্ভাব নির্ধারিত।" (রূহানী খাযায়েন, ১৪ খন্ড, ২২৪ পৃ:)

* "মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, ইয়া'জুজ-মা'জুজের সাথে মসীহ যুদ্ধ করবেন না। আর বুখারী শরীফ অনুযায়ী, তিনি যুদ্ধ রহিত করবেন অর্থাৎ খ্রিষ্টানদের সাথে বাহ্যিক যুদ্ধ করবেন না। তাই প্রমাণিত হলো, ইয়া'জুজ-মা'জুজই খ্রিষ্টান জাতিভুক্ত। আর এও প্রমাণিত হলো, মসীহ মাওউদ তাদের সাথে বাহ্যিক যুদ্ধ করবেন না, বরং কঠিন সময়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য ভিক্ষা চাইবেন আর তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। এথেকে আরও প্রমাণিত হলো, মসীহ মাওউদ ধারাপৃষ্ঠে খ্রিষ্টানদের আধিপত্যের যুগে আসবেন।" (হামামাতুল বুশরা, পৃ: ৪১)।

(৮) ইস্রায়েলী (ইহুদী) জাতির পূণঃ একত্রিকরণের সময়-কালের বিশেষ তাৎপর্য:

প্রায় দুই হাজার বছর পর ইহুদী-জাতির পূণঃ একত্রীকরণের প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নের যুগ-সন্ধিক্ষণে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আগমনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে ঐ যুগ সম্পর্কে সন্দেহাতীতরূপে জানা যায়। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে সূরা বণী-ইস্রায়েলে বলেছেন: "তাহার (মূসার) পর আমরা ইস্রায়েল জাতিকে বলিয়াছিলাম: তোমরা যমীনে (কেনানে) বসবাস কর, অতঃপর পরবর্তীকালে যখন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় আসিবে (ওয়াদুল আখেরা), তখন আমরা তোমাদিগকে (বিভিন্ন জাতির মধ্য হইতে) আনয়ন পূর্বক পুনরায় একত্রিত করিব।" (১০৫ আয়াত)

উল্লেখ্য যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ঐতিহাসিক 'বালফোর ঘোষণা' (১৯১৬ খৃ:) অনুযায়ী বৃটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা এবং কুটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইহুদীদের পৃথক আবাসভূমির পরিকল্পনা গৃহীত হয়, যা ১৯৪৯ সালে ইস্রায়েল রাষ্ট্র হিসেবে রূপ লাভ করে। এইভাবে পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী ইহুদীদের পুণরায় একত্রিকরণের ঐশী প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে শেষযুগের প্রতিশ্রুতি (ওয়াদুল আখেরা) সম্বন্ধে উক্ত আয়াতে যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং যথাসময়ে পূর্ণ হবে।

[চলবে]

আমি কিভাবে আহমদী হলাম

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

কিস্তি নং-১৭

বাংলা ডেস্কের যাত্রা আরম্ভ

চতুর্থ খেলাফতের প্রারম্ভে বাংলা ডেস্কের যাত্রা শুরু। হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ আর রাবে (রহ.) ১০ জুন, ১৯৮২ বৃহস্পতিবার খলীফা নির্বাচিত হলেন। ১১ই জুন শুক্রবার প্রথম খুতবা জুমুআর অনেক মহামূল্যবান বক্তব্য রাখলেন এবং একটি যুগান্তকারী ঘোষণা দিলেন। হুযুর (রাহে.) বললেন, আহমদীয়া জামাত এখন সাবালক এবং স্বাবলম্বী হয়ে গেছে। আগামীতে কেউ খেলাফতের নির্বাচন নিয়ে আর কোন বিতর্ক সৃষ্টি করার সুযোগ পাবে না।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) দাফতরিক কাজ আরম্ভ করলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তার প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিসে চারটি ডেস্ক বসালেন। (১) আরবী ডেস্ক, এর ইনচার্জ হিসেবে মওলানা ফজল ইলাহি বশির, মোবাল্লেগ ফিলিস্তিন কে নিয়োগ দেয়া হল, (২) ইংরেজী ডেস্ক, মওলানা হাবিবুল্লাহ্ ইংরেজি শিক্ষক জামেয়া আহমদীয়া কে ডেস্ক এর ইনচার্জ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হল। (৩) ইন্দোনেশীয়ান ডেস্ক, মওলানা সাঈদ আহমদ আনসারী সাহেব মোবাল্লেগ ইন্দোনেশীয়া কে ডেস্ক ইনচার্জ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হল। (৪) বাংলা ডেস্ক এর ইনচার্জ হিসেবে খাকসারকে নিয়োগ দেয়া হল।

সে সময় বাংলাদেশ থেকে বেশি চিঠি যেত না। প্রতিদিন যতগুলো চিঠি পত্র পেতাম সবগুলো অনুবাদ করে দিতাম। হুযুর চিঠিগুলো পড়ার পর যেরকম হেদায়েত দিতেন সেরকম উত্তর লিখতাম। পূর্বের মত ইংরেজিতে উত্তর লিখতাম। কিন্তু হুযুর শিঘ্রীই নির্দেশ দিলেন চিঠির উত্তর বাংলায় লিখতে হবে। বাংলায় লেখা পত্রের উপর হুযুর স্বাক্ষর করবেন। প্রথমত আমার ইচ্ছা হচ্ছিল না বাংলায় লেখার। কিন্তু হুযুর (রাহে.) এর নির্দেশে বাংলায় উত্তর লিখতে আরম্ভ করলাম।

এছাড়া বিদেশে কর্মরত মোবাল্লেগ সাহেবদের রিপোর্ট, চিঠিপত্র পড়ে সারাংশ করে হুযূরের খেদমতে পাঠানো আমার কতর্ব্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। নির্দেশ ছিল প্রতিদিনের কাজ ঐ দিনেই শেষ করতে হবে। কারণ প্রতিদিনের প্রাপ্ত রিপোর্ট গুলো পড়ে ঐ দিনই সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাংশ শেষ করতে হত। সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারী (বিদেশ বিভাগ) ও বসে থাকতেন। কাজ শেষ করে বের হতে হতে অনেক সময় মাগরেব হয়ে যেত।

যেদিন ডাক অর্থাৎ রিপোর্ট বা চিঠিপত্র বেশি থাকতো না সেদিন বাকী সময়ে পূর্বে প্রাপ্ত চিঠি গুলোর উত্তর লিখতে হত। আমরা কয়েকজন ইংরেজিতে উত্তর লিখে সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটারীকে দিতাম। তিনি পরীক্ষা করে Typist †ক দিতেন। টাইট হয়ে গেলে পি.এস সাহেব বার বার পরীক্ষা করে নির্ভুল ও সুন্দর করে, ঠিকঠাক করে স্বাক্ষরের জন্য হুযূরের খেদমতে পাঠাতেন। বিদেশে কর্মরত মোবাল্লেগগণের চিঠিপত্র ও রিপোর্ট পড়ে সারাংশ করতে গিয়ে আমার অনেক জ্ঞান লাভ হয়েছে। আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকার সব দেশের মুরুব্বীগণের রিপোর্ট পড়াতে সে সব দেশের অবস্থা, জামাতের অবস্থা জানতে পারতাম।রিপোর্ট পড়ে হুযূর কী মন্তব্য করলেন তাও পড়ে দেখার সুযোগ পেতাম। এটি অনেক বড় মূল্যবান জ্ঞানের বিষয় ছিল যে হুযূর কোন্ রিপোর্টের কোন্ কথায় কী উত্তর লিখেছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৮৪ সালে পাকিস্তান থেকে হিজরত করে লন্ডন চলে গেলেন। তারপরও আমাদের কার্যক্রম চলতে থাকল। তবে আস্তে আস্তে কাজ কম হতে থাকল। তারপর একসময় আমাদের ডেস্ক গুলোর কাজ শেষ হয়ে গেল। ১৯৮৬ সালে আমাকে নাযের এসলাহ্ ও ইরশাদ সাহেবের দফতরে পাঠানো হল। তারপর ঝিলাম শহরে মুরুব্বী হিসেবে নিয়োগ পেলাম। ঝিলাম খুব সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অঞ্চল। ঝিলাম নদীর পাড়ে ঝিলাম শহর অবস্থিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার ঝিলাম শহরে এসেছিলেন। ঝিলাম শহরে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সাহাবীহযরত মৌলভী বুরহান উদ্দীন (রা.)-এর মসজিদটি আমাদের জামাতের কেন্দ্র হিসাবে এখনো আছে। অনেক পুরাণ মসজিদ ছিল। পরবর্তীকালে পুরাতন মসজিদ ভেঙ্গে নতুন তিন তলা মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

শহরের বাইরে মোহতরম সাহেবযাদা মির্যা

মুনির আহমদ সাহেবের চিফ বোর্ড ফ্যাক্টরি ছিল। সাহেবযাদা মির্যা মুনির আহমদ এখানে অবস্থান করতেন। হযরত মির্যা মুনির আহমদ হযরত বশির আহমদ (রা.) এর সুযোগ্য সন্তান ছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ব্যবহৃত জিনিসপত্র তবারক (কল্যাণমন্ডিত)হিসাবে পরবর্তীতে হযরত (আ.)এর পরিবার বর্গের সকল সদস্যের মাঝে বিতরণ করা হয়েছিল। মোহতরম মিয়া সাহেব আমাকে ও আমার পরিবারকে তবারক গুলো দেখিয়েছিলেন। আমার মনে আছে একটি পাতিল বা হাঁড়ি সম্ভবত পিতলের পাতিলা আমরা দেখেছিলাম। পাতিলের গায়ে মিয়া মাহমুদ এর নাম খোদাই করা ছিল। এই পাতিলে এক দিন হযরত আম্মাজান মিঠা চাউল পাকিয়েছিলেন। চাল তো নিজেদের কয়েকজনের জন্য পাকানো হয়েছিল। হযরত (আ.) মিঠা চাউল খুব পছন্দ করতেন। মিঠা চাউল অর্থ সে দেশে গুড়দিয়ে চাল রান্না করা হয়। কিন্তু এটি আমাদের ক্ষীরের মত নরম হয় না। পোলাউ এর মত ঝর ঝরে হয়। কয়েকজনের জন্য পাকানো হয়েছিল। খাওয়ার সময় হযরত নবাব মোহাম্মদ আলী সাহেব (রা.) সপরিবারে হযরত (আ.) এর সাথে স্বাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। ঐ অল্প কয়েকজনের জন্য পাকানো মিঠা চাউল অলৌকিক ভাবে পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল। এতটা বৃদ্ধি হয়েছিল যে মেহমানসহ গৃহের সবাই খাওয়ার পরও বাইরে ও মেহমানদের জন্য পাঠানো হয়েছিল। সবাই জেনে আনন্দিত হয়েছিলেন যে বরকত মন্ডিত চাউল তারা খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।

ঝিলাম শহরে অনেক আহমদী ছিলেন। কয়েকটি বড় সম্মানিত পরিবারবর্গ এখানে বাস করতেন। সবাই আমাদের সাথে খুব ভাল ব্যবহার করেছেন। ১৯৭৪ সালে আহমদীয়া বিরোধী দাঙ্গা ফাসাদের সময় ঝিলাম শহরেও ৩৫টি আহমদী দোকান ছিল। সবগুলো জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল। আমি যখন মুরুব্বী ছিলাম, সেসময় ১৯৮৬ সালে আমি দেখলাম তিনটি দোকান নতুন করে আবার ব্যবসা শুরু করেছে। আল্লাহ তা'লা আহমদীদের বিজয় দান করুন।

আমরা ঝিলামে থাকার সময়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) আমার স্ত্রী ও সন্তানদের বাংলাদেশে বেড়াতে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। এপ্রিল ১৯৮৭ সনে আমার ছেলে মেয়েরা বাংলাদেশে এসেছিল। আমি ঝিলামে থেকে গিয়েছিলাম।

সে সময় আমাকে ইসলামাবাদ থেকে ২৫/৩০ মাইল দূরে একটি গ্রামে এক মাসের জন্য পাঠানো হয়। পাহাড়ী জঙ্গল এলাকায় একটি গ্রামে একটি জামাত আছে। এই গ্রামের লোকেরা কাশ্মীর থেকে হিজরত করে পাকিস্তানে এসেছিল। এখানে গরমের সময়েও শীতল আবহাওয়া। পাঞ্জাবে তখন প্রচন্ড গরম কাল। রোযার মাস ছিল। আমার রোযা রাখা খুব সহজ হয়েছিল। জঙ্গল এলাকা হওয়াতে আমার খুব ভাল লাগত। রাতে লেপ নিতে হত।

এখানে পাহাড়ী ঝর্ণার পানি অনেক নিচ থেকে আনতে হত। গ্রামগুলো পাহাড়ের উপর উচু স্থানে অবস্থিত। কাশ্মীরীদের অদ্ভুত রীতি। মহিলারা কাজ করে। পুরুষরা কেবল হাল চাষ করে। ফসল জমিতে দেয়া, ফসল কাটা, মাড়াই করা সহ সমস্ত কাজ মহিলারা করে।

১৯৮৭ সনে এপ্রিল মাসে আমার স্ত্রী ছেলেমেয়েরা বাংলাদেশে এসেছিল। জুন মাস রাবওয়া ফেরত যাবার কথা ছিল। কিন্তু ইতোমধ্যে বাংলাদেশে আমাকে বদলী করা হল। ফলে আমার পরিবারের আর রাবওয়া যাওয়া হল না। আমাকে বাংলাদেশে আসার নির্দেশ দেয়া হল। এতে আমার পরিবার খুব কষ্ট পেয়েছিল। কারণ তাঁর ফেরত যাবার কথা ছিল। সেভাবেই প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল। যাহোক ওয়াকফে জিন্দেগীদের তো এমন কষ্ট সহ্য করতেই হয়। আমার স্ত্রী দশ বছর পাকিস্তানে অবস্থান করেছেন। সেখানে আমার পাঁচজন ছেলে মেয়ের জন্ম হয়েছে।

পাকিস্তান ছেড়ে স্বদেশে ফেরত আসতে হবে। প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করলাম। প্রথমত বাংলাদেশের ভিসা নিতে হল। কারণ আমার কাছে পাকিস্তানী পাশপোর্ট ছিল।

রাবওয়া ছেড়ে আসার পূর্বে সেখানকার কিছু কথাঃ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া রাবওয়ার খেদমতের সুযোগ পেয়েছিলাম। রাবওয়া যাবার এক বছর পর থেকে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া রাবওয়ার খেদমতে নিয়োজিত হয়েছিলাম। জামেয়া হোস্টেলের যয়ীম সাহেবরা যখন যিনি দায়িত্ব পেয়েছেন আমাকে কোন না কোন দায়িত্ব দিয়েছেন। নায়েব মুনতাযেম আতফাল হিসাবে কর্তব্য পালন আরম্ভ করেছিলাম। পরে মুনতাযেম আতফাল, মুনতাযেম তরবিয়ত এভাবে বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলাম।

অপর পক্ষে মজলিস আতফালুল আহমদীয়া মরকেযীয়াতে দায়িত্ব পালন করেছিলাম। আমি ১৯৬৮ সনে রাবওয়া গিয়েছিলাম তখন হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) খোদ্দামুল আহমদীয়া মরকেযীয়ার সদর ছিলেন। তারপর চৌধুরী হামিদুল্লাহ্ সাহেব সদর হলেন। মোহতরম মওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ মোহতামীম আতফালুল আহমদীয়া মরকেযীয়া হলেন। তিনি আমাকে মজলিস আতফালুল আহমদীয়া মরকেযিয়ার এ্যাডিশনাল জেনারেল সেক্রেটারী হিসাবে নিয়োগ দিলেন। পূর্ব পাকিস্তান আতফালুল আহমদীয়ার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা আমার কর্তব্য ছিল। মোহতামীম আতফাল সাহেব উদ্যোগ নিতে বললেন। আমরা চেষ্টা করলাম যেন ১৯৭০ সনের ইজতেমা খোদ্দামুল আহমদীয়ার মরকেযীয়ার সময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে খোদ্দামদের সাথে কয়েকজন আতফালও রাবওয়া যান। একই সময়ে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমার সাথে আতফালুল আহমদীয়ার ইজতেমা হত। তবে পৃথক মাঠে আতফালদের ইজতেমা হত। সে বছর দুজন আতফাল এখান থেকে মরকেযি ইজতেমায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। (১) জামাল উদ্দীন আহমদ পিতা লকিয়তুল্লাহ্ মরহুম চট্রগ্রাম (২) শেখ মনসুর আহমদ পিতা শেখ জাফর আহমদ ঢাকা থেকে গিয়েছিলেন। এটি আমাদের একটি ভাল সাফল্য ছিল। আমাদের দুজন আতফালের সাথে সদর খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং মোহতামীম আতফালুল আহমদীয়ার গ্রুপ ফটো হয়েছিল। আমার কাছে ফটো গুলো ছিল কিন্তু কালক্রমে সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে।

এরপর বাংলাদেশ স্বাধিন হয়ে গেল। আর ঐ রকম যোগাযোগ থাকল না।

পরে খোদ্দামুল আহমদীয়া মাকামী

রাবওয়াতেও কর্তব্য পালন করেছিলাম। প্রথমে নায়েব নাযেম আতফাল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছি। সমগ্র রাবওয়াতে ২৯টি হালকা ছিল সে সময় প্রত্যেক হালকায় একজন যয়ীম হতেন। প্রত্যেক হালকায় একশ দেড়শ খোদ্দাম থাকতেন। পুরো রাবওয়ার যিনি প্রধান তিনি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া মরকেযিয়ার মোহতামীম হতেন। ২৯ টি হালকার যয়ীম হওয়ার কারণে ৫/৬ জন যয়ীমের উপর একজন ব্লক লিডার নিয়োগ দেয়া হত। কিছু কাল ব্লক লিডার হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছিলাম।

মুরুব্বী হিসাবে প্রায় পাঁচ বছর রাবওয়ার বাইরে ছিলাম। তারপর বাংলা ডেস্কের ইনচার্জ হিসাবে প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিসে কর্মরত থাকা কালে রাবওয়া খোদ্দামুল আহমদীয়া মাকামীর নাযেম তরবিয়ত হিসাবে কয়েক বছর খেদমতের সুযোগ পেয়েছিলাম। সে সময় মোহতরম সৈয়্যদ খালেদ আহমদ শাহ্ সাহেব মোহতামীম মাকামী ছিলেন। মোহতরম সৈয়্যদ খালেদ আহমদ শাহ্ সাহেব কিছুদিন পূর্বে "নাযেরে আলা"-র মহাসম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। খোদ্দামুল আহমদীয়ায় যখন তাঁর সাথে কাজ করতাম তখনই দেখেছিলাম তিনি বড় বুযুর্গ ও নেক (ফিতরতের) প্রকৃতির যুবক ছিলেন। আমি তাকে জীবন উৎসর্গ করার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলাম। তখন তিনি ব্যাংকের ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। কিছুকাল পরে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি জীবন উৎসর্গ করবেন এবং ওয়াকফ করলেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর ওয়াকফ আবেদন অনুমোদন করত তাঁকে আমানত তাহরিকে জাদীদে সেকেন্ড অফিসার হিসাবে নিয়োগ দান করেছিলেন। তিনি কর্ম ক্ষেত্রে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে থাকেন। শেষে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নাযের বায়তুল মাল আমদ হিসাবে কর্তব্য পালন করছিলেন। কিছুকাল পূর্বে মোতরতম সাহেবযাদা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব নাযেরে আলা এর ইন্তেকালের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) তাঁকে নাযেরে আলা পদে নিয়োগ দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে দীর্ঘদিন এই মহাগুরুত্বপূর্ণ পদে সুচারু রুপে দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করুন।

(চলবে)

এ যুগের নিরাপদ দূর্গ

'এ যুগের দুর্ভেদ্য দূর্গ আমি। যে ব্যক্তি আমাতে প্রবেশ করে সে চোর দস্যু ও হিংস্র জন্তু থেকে নিজ প্রাণ রক্ষা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার প্রাচীর থেকে দূরে থাকতে চায় তার চারদিকে মৃত্যু বিরাজমান এবং তার লাশও নিরাপদ নয়। আমাতে কে প্রবেশ করে? সে-ই যে পাপ বর্জন করে এবং পুণ্য অবলম্বন করে এবং বক্রতা ছেড়ে সাধুতার দিকে অগ্রসর হয় ও শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে খোদা তা'লার এক অনুগত দাসে পরিণত হয়। যে-ই এরূপ করবে সে আমার ও আমি তার।'

–প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)

নবীজির (সা.) প্রতি দরূদ

সিবগাতুর রহমান

আল্লাহুম্মা সাল্লে আ'লা নাবীয়্যেনা মুহাম্মাদীন (সা.)
আল্লাহুম্মা সাল্লে আ'লা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদীন (সা.)।

যাঁর লাগিয়া সৃষ্টি হইল জমিন আর আসমান
যাঁর প্রেমেতে ফেরেশতা আর আল্লাহু রহমান
মহিমা যাঁর দিন রজনী গাইছে বিরামহীন
সেই নবীজির নামের দরূদ পড় ভাই মু'মিন
আল্লাহুম্মা সাল্লে আ'লা নাবীয়্যেনা মুহাম্মাদীন (সা.)
আল্লাহুম্মা সাল্লে আ'লা মওলানা মুহাম্মাদীন (সা.)।

মহান খোদার আরশ 'পরে যাহার ছবি রাখা
যাঁর রূপেতে সকল নবীর প্রেমের পরশ মাখা
সকল নবীর শিরোমণি আওয়াল ও আখেরিন
সেই নবীজির নামের দরূদ পড় ভাই মু'মিন
আল্লাহুম্মা সাল্লে আ'লা নাবীয়্যেনা মুহাম্মাদীন (সা.)
আল্লাহুম্মা সাল্লে আ'লা হাবীবেনা মুহাম্মাদীন (সা.)।

দুই জাহানের আশিস যাঁরে করল বিধাতায়
যাঁর পরশে মঙ্গল সব দিলো নিজ করুণায়
যাঁহার খাতিরে খোদার দয়া হিসাব বিহীন
সেই নবীজির নামের দরূদ পড় ভাই মু'মিন
আল্লাহুম্মা সাল্লে আ'লা নাবীয়্যেনা মুহাম্মাদীন (সা.)
আল্লাহুম্মা সাল্লে আ'লা কারীমেনা মুহাম্মাদীন (সা.)।

যাঁহার নূরেতে আলোকিত হইলো আঁধার যুগ
যাঁর ছোঁয়াতে উজ্জ্বল হলো সকল কালো মুখ
যাঁহার পরশে মহান হলো যাযাবর বেদুঈন
সেই নবীজির নামের দরূদ পড় ভাই মু'মিন
আল্লাহুম্মা সাল্লে আ'লা নাবীয়্যেনা মুহাম্মাদীন (সা.)
আল্লাহুম্মা সাল্লে আ'লা রফীক্বেনা মুহাম্মাদীন (সা.)।

কুরআান খোলে দেখনা কি বলেন আমার সাঁঈ
যাঁর প্রেমেতে সকল মহান এনাম পাওয়া যায়
যাঁরে ভালোবাসার ফলে ফিরলো আবার দ্বীন
সেই নবীজির নামের দরূদ পড় ভাই মু'মিন
আল্লাহুম্মা সাল্লে আ'লা নাবীয়্যেনা মুহাম্মাদীন (সা.)
আল্লাহুম্মা সাল্লে আ'লা রউফেনা মুহাম্মাদীন (সা.)।

নবী সিদ্দিক শহীদ ও সালেহ কতইনা এনাম
যাঁর প্রেমেতে মাহদী হইলো আহাম্মদ গোলাম
যাঁহার প্রেমে আসলো আবার খেলাফতে দ্বীন
সেই নবীজির নামের দরূদ পড় ভাই মোমিন
আল্লাহুম্মা সাল্লে আ'লা নাবীয়্যেনা মুহাম্মাদীন (সা.)
আল্লাহুম্মা সাল্লে আ'লা রাহীমেনা মুহাম্মাদীন (সা.)।

বক্তৃতা– বিষয়: প্রকৃত নামায-ই সকল কল্যাণের উৎস

বক্তা: মোহতরম সৈয়দ মাহমুদ আহমদ শাহ সাহেব (হুযূর আকদাস (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি)

স্থান: সমাপ্তি অধিবেশন, ৯৪তম সালানা জলসা, বাংলাদেশ

তাশাহ্‌হুদ, তাউয ও তাসমিয়া পাঠ করার পর তিনি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দু'টি তিলাওয়াত করেন:

উচ্চারণ: **"উতলু মা উহিয়া ইলাইকা মিনাল কিতাবি ওয়া আকিমিস সালাতা, ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাঈ ওয়াল মুনকারি, ওয়ালাযিকরুল্লাহি আকবার, ওয়াল্লাহু ইয়া'লামু মা তাসনাউন।"**

অনুবাদ: "ঐশী গ্রন্থের যা তোমার প্রতি ওহী করা হয় তা মানুষকে পড়ে শুনাও এবং নামায প্রতিষ্ঠা কর। নিশ্চয়ই নামায অশ্লীলতা এবং প্রত্যেক ধরণের মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। আর আল্লাহকে স্মরণ করা সকল প্রকার যিকিরের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।" (আল আনকাবুত: ৪৬)

উচ্চারণ: **"ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈতাঈযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা আনিল ফাহশাঈ ওয়াল মুনকারি ওয়ালবাগয়ি, ইয়া'ঈযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন।"** (আন নাহ্‌ল: ৯১)

এর পর বলেন, প্রত্যেক জুমু'আর দিন খুতবায়ে সানিয়াতে আমরা আল্লাহ্ তা'লার এই বাণী শুনে থাকি। আর তা হল, **"ইয়ানহা আনিল ফাহশাঈ ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগয়ি"** (আন নাহ্‌ল: ৯১) –'ফাহশা' শব্দের অর্থ লাগামহীন অশ্লীলতা, এমন অশ্লীলতা যার ফলে সমাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় আর 'মুনকার' শব্দের অর্থ সকল মন্দ বিষয়াবলী, তা কর্মের মাধ্যমে হতে পারে অথবা নিয়্যতের অবস্থাতেও হতে পারে আর 'বাগয়ি' অর্থ বিদ্রোহ– এ সকল অপকর্ম করতে আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে নিষেধ করেন।

আরেকটি বিষয় হল, আল্লাহ্ তা'লা যখন কোন কাজ করার আদেশ দেন তখন উক্ত আদেশের উপর আমল করার পদ্ধতিও শিখিয়ে দেন। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

উচ্চারণ: **"ওয়ালাকাদ ইয়াস্‌সারনাল কুরআনা লিয্‌যিকরি, ফাহাল মিন মুদ্দাকির"। (সূরা আল কামার: ২৩)**

অর্থাৎ: "আমরা কুরআনকে উপদেশ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এবং আমল করার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব উপদেশ গ্রহণ করার কেউ কি আছে?"

আল্লাহ তা'লা এ তিন বিষয়ে আমল করার জন্য একটি সহজ পদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন তথা যদি তোমরা বাঁচতে চাও তাহলে 'আকিমিস সালাত' অর্থাৎ নামায প্রতিষ্ঠা করে দেখাও। "ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাঈ ওয়াল মুনকার" নিশ্চয় নামায তোমাদেরকে সকল প্রকারের অশ্লীলতা এবং সকল প্রকার মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। পাশাপাশি এ-ও বলে দিয়েছেন, নামাযের যে মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা, কেবল বাহ্যিক নামায, সে নামায নয়, তা ঐ সকল মন্দ বিষয় থেকে রক্ষা করে না, বরং যে নামাযে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করাকে মৌলিক প্রাধান্য দেয়া হবে সেই নামায তোমাদেরকে পবিত্র করবে। তোমরা আল্লাহ্ তা'লাকে প্রতারিত করতে পারবে না, কেননা তোমরা যা-ই কর, যে উদ্দেশ্যেই নামায পড়– তা আল্লাহ্ তা'লা ভালো করে জানেন।

হযরত আকদাস মসীহে মাওউদ (আ.) বলেন: আমি বিশ্বাস করি, কেউ যদি দশটি দিনও আন্তরিকভাবে সাজানো-গোছানো নামায পড়ে, তাহলে তার আত্মা আলোকিত, জ্যোতির্ময় হয়ে যায়।

হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) আরও বলেন: 'প্রাকৃতিক নিয়ম হল, কোন গন্তব্যে পৌঁছতে হলে আমাদেরকে পথ ধরে হাঁটতে হয়। গন্তব্য যত দূরে হবে তত দ্রুত গতিতে যেতে হবে, ধৈর্য সহকারে যেতে হবে এবং দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। অতএব আল্লাহ্ তা'লাকে লাভ করাও আমাদের জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্য বা গন্তব্য এবং এ পথের দূরত্বও অনেক। অতএব সেই পথ আমাদেরকে অতিক্রম করতে হবে। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভ করতে চায় এবং তাঁর দরবারে পৌঁছতে চায়, তার বাহন হল নামায। অতএব নামাযের বাহনে চড়ে মানুষ দ্রুত গতিতে চলে সেই গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ করে সে কীভাবে সে পথে চলতে পারে?'

নামায পড়লে যে তৃতীয় অপকর্ম থেকে মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারে সেটি হল, বিদ্রোহ। নামাযের মাঝে ইমামের পেছনে মুসল্লি ইমামের প্রত্যেকটি শব্দ উচ্চারণের সাথে সাথে তার অনুসরণ করে। যদি ইমাম ভুলও করে তখনও কেবল সুবহানাল্লাহ্ বলে মনোযোগ আকর্ষণ করা যেতে পারে, নামায পরিত্যাগ করে পৃথক হবার সুযোগ নেই। যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে কিয়াম, কু'উদ, রুকু-সিজদা করে তার বিষয়ে রসূলে পাক(সা.) বলেছেন, "আল্লাহ তা'লা তার মাথা গাধার মাথার ন্যায় বানিয়ে দিবেন।" ইমামের পূর্বে যে নামাযে কিয়াম, কু'উদ, রুকু-সিজদা করে তাকে কত কঠোরভাবে সাবধান করা হয়েছে!

নামায যেখানে অশ্লীলতা এবং অপছন্দনীয় কাজ থেকে আমাদেরকে বিরত রাখে সেখানে আমাদেরকে অনুবর্তিতাও শেখায়

এবং বিদ্রোহ করতে বারণ করে। নেযামে জামাতের উপমাও ঠিক তেমনি। অর্থাৎ আপনি যদি কোথাও কোন ভুল দেখতে পান তাহলে কথার মাধ্যমে তাকে বুঝানোর চেষ্টা করুন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ঘটনার উল্লেখ করুন আর যে সিদ্ধান্ত দেয়া হয় তা মেনে নিন, বিদ্রোহী হয়ে নেযামে জামাত থেকে পৃথক হবেন না। অতএব বাজামাত নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে দৈনিক পাঁচবার এই শিক্ষা-ই দিচ্ছেন, 'বিদ্রোহ করবে না'। আর এটিও শেখাচ্ছেন, যখন তোমরা তোমাদের নির্ধারিত ইমামকে এতটা এতায়াত করছ অর্থাৎ তার এক ডাকে দাঁড়াচ্ছ, রুকু-সিজদা করছ, সেক্ষেত্রে সেই মহান ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'লা ইমাম বানিয়েছেন, তার প্রত্যেকটি ডাকে মনে-প্রাণে লাব্বায়েক বলা কতটা আবশ্যকীয় হবে? একদিকে তোমাদের ইমামের ইমামতির সময় তার পূর্বে রুকু, সিজদা-কিয়াম করলে গাধার মাথার ন্যায় মাথা হবে বলে সাবধান করা হয়েছে, তাহলে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা যাকে ইমাম বানিয়েছেন তাঁর অবাধ্য ব্যক্তির ঠিকানা নিশ্চিত জাহান্নামই হবে।

আল্লাহ তা'লা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

উচ্চারণ: **"ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়া'বুদুন"।**

অর্থাৎ: "আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে কেবল ইবাদাতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আয যারিয়াত: ৫৭)

সেই ইবাদাত কেমন হওয়া আবশ্যক? মহানবী (সা.) বলেন:

উচ্চারণ: **আদ্ দুআউ মুখখুল ইবাদাত"।**

অর্থাৎ 'প্রকৃত ইবাদাত সেটিই যেখানে অনেক দোয়া থাকবে।'

অতএব ইবাদাতের মূল বিষয় হল দোয়া। আল্লাহ্ তা'লা নিজ বান্দার প্রতি দোয়ার মাধ্যমেই তথা দোয়ার কারণেই কৃপা করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

উচ্চারণ: **"মা ইয়া'বাউ বিকুম রাব্বি লাও লা দুআউকুম।"**

অর্থাৎ: তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের কী ধার ধারতেন যদি তোমরা দোয়া না করতে? (সূরা আল ফুরকান: ৭৮)

সেই ইবাদাত যা দোয়া দ্বারা পরিপূর্ণ এমন ইবাদাত করলে খোদা তা'লা আমাদের পরোয়া করেন, আমাদের প্রতি সুদৃষ্টি দেন, আমাদেরকে সকল প্রকার সমস্যা থেকে পরিত্রাণ দান করেন। অতএব সেই ইবাদাত কী? হুযূর পাক(সা.) বলেছেন:

উচ্চারণ: **"আস সালাতু হিয়াদ্দুয়া"।**

অর্থাৎ: 'নামায হল মূর্তিমান দোয়া।'

অতএব আমাদের নামায যদি মূর্তিমান দোয়া না হয় তাহলে আমরা আমাদের ইবাদাতের দায়িত্ব সঠিক অর্থে পালন করলাম না। পবিত্র কুরআনের সূচনাতে আল্লাহ তা'লা বলেছেন,

উচ্চারণ: **"ইউ'মিনুনা বিল গাইবি"।**

অর্থাৎ: "তারা অদৃশ্যে ঈমান রাখে।" (সূরা আল বাকারাহ, আয়াত: ৫)

অদৃশ্য বিষয় কী? অদৃশ্য বিষয়সমূহ হল, আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব, ফিরিশতা, এমনকি মৃত্যুর পর পূনর্জীবনও। আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্যে থেকে, পর্দার আড়ালে থেকে আমাদেরকে এ পদ্ধতি শিখিয়েছেন –যদি অদৃশ্যকে নিজেদের সম্মুখে দেখতে চাও তাহলে নামায প্রতিষ্ঠা করে দেখাও। "ইউ'মিনুনা বিল গাইবি"র সাথে "ওয়া ইউকিমুনাস সালাতা" শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ তা'লা জানিয়ে দিয়েছেন –যে জিনিসটা তোমাদের কাছে অদৃশ্য মনে হচ্ছে, যদি তোমরা সঠিক অর্থে নামায প্রতিষ্ঠা কর তাহলে তা দৃশ্যমান হয়ে তোমাদের কাছে ধরা পড়বে, এমনকি সেই অদৃশ্য বিষয়াদি তোমাদের জীবন শিরারও কাছে পাবে। সেই কবিতার ন্যায় যেখানে বলা হয়েছে:

অনুবাদ: আমরা নিজের বুকে চরম বন্ধুর
চিত্র অঙ্কন করে রেখেছি,
যখন দেখতে মন চায়, মাথাটা নুইয়ে আমি
আমার বন্ধুকে দেখতে পাই।

হযরত মসীহে মাওউদ(আ.) বলছেন, **"ইন্নাল হাসানাতা ইউযহিবনাস সাইয়্যিআত"**– এখানে যে **হাসানাত** শব্দ ব্যবহার হয়েছে তার অর্থ হল **নামায** যা সমস্ত মন্দ অভ্যাসকে দূরীভূত করে দেয়। আর অন্য স্থানে আল্লাহ বলেছেন: নামায অশ্লীলতা এবং সকল প্রকার মন্দ অভ্যাস থেকে মানুষকে রক্ষা করে। (সূরা আনকাবুত: ৪৬) আমাদের সকলের অভিজ্ঞতা আছে– অনেক লোক নামায পড়া সত্ত্বেও মন্দকাজ পরিত্যাগ করে না। এর উত্তর হল, এরা যারা নামায পড়ছে তারা কেবল অভ্যাসগতভাবে বা একটি আচার আচরণ হিসেবে নামায আদায় করছে, প্রকৃতপক্ষে অন্তর থেকে তারা নামায আদায় করছে না। আল্লাহ তা'লা এই ধরণের বাহ্যিক নামাযের নাম **হাসানাত** রাখেন নি। এখানে **হাসানাত** শব্দ রেখেছেন, **আস সালাত** শব্দ রাখেন নি। এর কারণ হল, যেন নামাযের মূল উদ্দেশ্য এবং সৌন্দর্য কিসে এবং সার বস্তু কী– সেদিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষিত হয়। সেই প্রকৃত নামায মানুষের মন্দ অভ্যাস এবং পাপকর্ম দূরীভূত করে যে নামাযে সততা, আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠা দেখতে পাওয়া যায়। যে নামাযের মাঝে কল্যাণ আহরণকারী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান সেই নামায অবশ্যই মন্দ অভ্যাসকে দূরীভূত করে দেয়। নামায নিছক ওঠা-বসার নাম নয়। নামাযের মূল আকর্ষণ ও নির্যাস সেই দোয়া যার মাঝে একটি স্বাদ, একটি আনন্দ খুঁজে পাওয়া যায়। সেই নামাযই আল্লাহ তা'লার সাথে মানুষের সাক্ষাৎ করাতে পারে যে নামাযে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সততা থাকে।

আমাদের প্রাণপ্রিয় খলিফা হযরত মীর্যা মাসরুর আহমদ খলিফাতুল মসীহ আল খামেস(আই.) বলেছেন: "নামাযকে সঠিকভাবে, গুছিয়ে, সুন্দরভাবে আদায় করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল, সময়মত নামায আদায় করা। আর সময় মত নামায পড়ার এই চেতনা এবং অভ্যাস এ কথা সাব্যস্ত করবে –আল্লাহর এই বান্দা, এই মানুষটি সময়মত নামায পড়ার ব্যাপারে চেষ্টা করছে এবং তার নামায পড়ার অভ্যাসও রয়েছে।

সময়মত নামায আদায় করার বিষয়ে আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

উচ্চারণ: **"ইন্নাস সালাতা কানাত আলাল মু'মিনিনা কিতাবাম মাওকুতা"।**

অর্থাৎ "নামায এমন একটি ফরয তথা আবশ্যক বিষয় যেটি নির্ধারিত সময়

আদায় করা প্রত্যেক মোমেনের জন্য আবশ্যক।" (সূরা আন নিসা: ১০৪)

এর মাঝে এক বিশেষ গুরুত্বও রয়েছে। বলা হয়েছে, নামায তখন গুছিয়ে পড়া সার্থক হবে, সঠিক অর্থে নামায বলে পরিগণিত হবে যখন সময়মত নামায আদায় করা হবে। কেননা মোমেনের জন্য বাজামাত নামায আদায় করা ফরয। পবিত্র কুরআনের আদেশ হল, নামায কায়েম কর আর নামায সকল শর্তসহ আদায় কর। মহানবী(সা.) নামায প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে যা যা আমাদেরকে শিখিয়েছেন তার মাঝে একটি হল, **'মসজিদে গিয়ে বাজামাত নামায আদায় করা'**। আমাদেরকে বাজামাত নামায আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে তিনি (সা.) বলছেন,

"বাজামাত নামায আদায় করা একক নামায আদায়ের চেয়ে সাতাশ গুণ বেশি পুণ্যের ভাগী করে।"

এরপর আমাদের প্রিয় ইমাম কীভাবে নামায বাজামাত আদায়ের গুরুত্ব হৃদয়ে সৃষ্টি করতে হবে সে বিষয়টিও বলে দিয়েছেন। হুযূর(আই.) বলেন:

সব জায়গায় আমাদের মসজিদ নেই। এখানেও হয়তো লোকেরা দূর-দূরান্তে বসবাস করে থাকবেন। যারা মসজিদে আসতে পারে তাদের অবশ্যই মসজিদে আসা উচিৎ আর যারা আসতে পারে না তারা পাশের বাড়িতে সকলে মিলে নামায সেন্টার প্রতিষ্ঠা করুন এবং বাজামাত নামায পড়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন। এমনিভাবে অন্যান্য শহরের লোকেরা যেখানে মসজিদ অনেক দূরে তারা ঘরের সদস্যরা মিলে বাজামাত নামায আদায় করার অভ্যাস সৃষ্টি করুন। যতটা সম্ভব বিভিন্ন ঘরের সদস্য একত্রিত হতে পারেন, একত্রিত হয়ে এক জায়গায় একটি নামায কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করুন। আর যেখানে কেন্দ্র বানানো সম্ভব নয় সেখানে ঘরের কর্তা পরিবারের সবাইকে নিয়ে বাজামাত নামাযের অভ্যাস গড়ে তুলুন। এর ফলে যেক্ষেত্রে বাজামাত নামায আদায় করে সাতাশ গুণ পুণ্য অর্জন করতে সক্ষম হবেন সেক্ষেত্রে আপনাদের সন্তানদের হৃদয়েও নামাযের গুরুত্ব সৃষ্টি হবে। আর একবার যখন সন্তানদের মাঝে তথা নতুন প্রজন্মের মাঝে বাজামাত নামায পড়ার গুরুত্ব গেঁথে যাবে তখন সারা জীবন তারা গুছিয়ে এবং আন্তরিকতার সাথে নামায পড়ায় অভ্যস্ত হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে সমাজের গড্ডালিকা প্রবাহে নিজ সন্তানদের ভেসে যাওয়ার দুশ্চিন্তাও দূরীভূত হয়ে যাবে। যারা সত্যিকার অর্থে নামায পড়েন, যারা আন্তরিকতার সাথে নামায পড়েন সেই নামায তাদেরকে সকল প্রকার মন্দকর্ম এবং অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করে– এটি আল্লাহ তা'লার প্রতিশ্রুতি। নামায তাদের রক্ষাকবচ হয়ে যাবে এবং নামায তাদের পাহারায় দাঁড়িয়ে থাকবে। তাই এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সাধারণ কোন বিষয় নয়। নিজেদের পরবর্তী বংশধরদেরকে যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে নিজেরাও নামাযের অভ্যাস গড়ে তুলুন এবং সন্তানদের মাঝে নামাযের অভ্যাস সৃষ্টি করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এ কাজের সৌভাগ্য দান করুন। সেই নামায গৃহীত হবে যে নামাযের উদ্দেশ্য হবে, **"ওয়া লাযিকরুল্লাহি আকবার"**, যে নামাযে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা অগ্রগণ্য করা হবে। যে নামায লোক দেখানো সকল রোগ-বালাই থেকে মুক্ত হবে এবং কেবল আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে সমর্পিত হবে সেই নামাযই গৃহীত হবে।

নামায আযানের মাধ্যমে শুরু হয় এবং আযান **আল্লাহু আকবার** দ্বারা শুরু হয় এবং **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ** দ্বারা শেষ হয়। আর এভাবে তাকবীর **আল্লাহ** দ্বারা শুরু হয়ে **আল্লাহ্**তেই শেষ হয়। নামাযও **আল্লাহ্** শব্দ দিয়ে শুরু হয় এবং **আল্লাহ্** শব্দ দিয়েই শেষ হয়। তোমাদের সূচনা হয়েছিল আল্লাহ্ তা'লার নামে এবং তোমাদের সমাপ্তিও হবে আল্লাহ্ তা'লার নামে– আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে প্রতিদিন এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। অতএব এর মাঝে অবশিষ্ট জীবন যা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে সেখানে যদি আল্লাহ্ তা'লার স্মরণে এবং আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা অনুযায়ী কাটাও তাহলে তোমাদের জীবন সফল হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

উচ্চারণ: **"কাদ আফলাহাল মু'মিনুন, আল্লাযীনা হুম ফি সালাতিহিম খাশিউন"**।

অর্থাৎ: "নিশ্চিতভাবে সেসব মোমেনের দল সফল হয়েছে যারা নিজেদের নামাযে বিনয় অবলম্বন করেছে।" (সূরা আল মু'মিনুন: ২-৩)

আর নামাযের মাঝে যতবার আমরা রুকু-সিজদা করি ততবার আমরা আল্লাহু আকবার বলি এবং এই কাজ আমাদেরকে সকল প্রকার নৈরাশ্য এবং হতাশা থেকে মুক্ত করে। আরও বলা হচ্ছে, তোমাদের কোন চাহিদা আল্লাহর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়। অতএব তোমরা তোমাদের প্রভু আল্লাহর কাছে চাও, তিনি সবচেয়ে বড় এবং তিনিই সকল সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। আর এটিও বুঝানো হচ্ছে, তোমরা জগতের শক্তিশালী লোকদেরকে ভয় করো না, আর তাদের সম্মুখে মাথানত করো না তাদের কাছে কিছুই পাবে না, কেবল এক সত্তা যে সত্তা সবচেয়ে মহান তা হল আল্লাহ তা'লার সত্তা। আর যে ব্যক্তি তাঁর কাছে যাচনা করে তাকে দেয়া হয়। আর যে-ই তাঁর দারে কড়া নাড়ে তার জন্য দার উন্মুক্ত করা হয়। নামাযের পরিসমাপ্তিতে আল্লাহু আকবার নয় বরং আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলা হয়। এই পরিবর্তন কেন? এর মাঝেও গভীর তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে। আর তা হল– খোদা তা'লা আমাদেরকে বুঝাচ্ছেন, তোমরা সালামের মাধ্যমে আল্লাহ তা'লার দরবার থেকে বের হয়ে নিজেদের জগতে চলে যাচ্ছ, অতএব সমস্ত জগতের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী নিয়ে বের হও। তোমাদের ডান দিকের লোক যারা তোমাদের আপন ও একমত পোষণকারী তাদেরকে শান্তির বার্তা দাও আর বাম দিকের লোক যারা তোমাদের আপন নয় বা তোমাদের মতাদর্শের লোক নয় তাদেরকেও শান্তি ও নিরাপত্তার বার্তা প্রদান কর। অতএব এমন নামাযই আমাদেরকে সত্যিকার মুসলমান বানিয়ে বের করে।

এ বিষয়ে মহানবী (সা.) বলেছেন,

উচ্চারণ: **"আল মুসলিমু মান সালিমাল মুসলিমুনা মিললিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি"**।

মহানবী (সা.) আরো বলেছেন:

উচ্চারণ: **"আল মুসলিমু মান সালিমান্নাসা মিললিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি"।**

অর্থাৎ: সত্যিকার মুসলমান সে যার হাত এবং মুখ দ্বারা কোন মুসলমানের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন হয় না। আর খাঁটি মুসলমান তারা যাদের হাত ও মুখ দ্বারা কোন মানুষের কোন প্রকার ক্ষতি হয় না। (বুখারী, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং : ১০ ও মুসলিম কিতাবুল ঈমান, হাদীস নং: ৪০)

–এই হল সত্যিকার নামায যার মাধ্যমে সমস্ত জগত শান্তির চাদরে ঢাকা পড়বে। হযরত মসীহে মাওউদ(আ.) বলছেন: "ঐ নামায এবং ঐ রোযা দ্বারা কী উপকার সাধন হবে অর্থাৎ মসজিদে নামায পড়লেন আবার সেই মসজিদে বসেই অন্য কারো গীবত করলেন? অথবা নামায পড়া সত্ত্বেও রাতে চুরির অভ্যাস আছে? অথবা কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করলেন। কারো কোন সম্মান যে সম্মান আল্লাহ্ তাকে দিয়েছেন, হিংসা-বিদ্বেষের কারণে তার সেই সম্মানে আঘাত করলেন? অথবা কারো আত্মসম্মানে আপনি আঘাত হেনেছেন? যদি এসব দোষ এবং দুর্বলতায় মানুষ নিজেকে আচ্ছন্ন করে রাখে তাহলে তোমরাই বল, এমন নামায তার কী উপকারে আসতে পারে?"

মহানবী(সা.) বলেছেন:

উচ্চারণ: **"আস্ সালাতু নূরুন"।**

অর্থাৎ: "নামায সম্পূর্ণটাই নূর ।"

অতএব এই নূর যখন মানুষ লাভ করে তখন সকল অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়।

হযরত মসীহ মাওউদ(আ.) এর একটি পংক্তিতে বলেছেন:

উচ্চারণ: **"জাব তেরা নূর আয়া, জাতা রাহা আন্ধেরা"।**

'যখন তোমার পক্ষ থেকে জ্যোতি লাভ করেছি,
তখন আমার মাঝে সকল অন্ধকার দূরীভূত হয়ে গেছে।'

এই নূরের বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

উচ্চারণ: **"নূরুহুম ইয়াস'আ বাইনা আইদিহিম ওয়া বিআইমানিহিম"**এই আত্মিক জ্যোতি মোমেন মুসল্লিদের সামনেও এগোতে থাকবে এবং তাদের ডান দিকেও চলমান থাকবে। (সূরা আত তারমিম: ৯)

আমাদের কুরআনের আরেকটি দোয়াও অধিকহারে পাঠ করা আবশ্যক আর তা হল:

উচ্চারণ: **"রাব্বানা আতমিম লানা নূরানা ওয়াগফির লানা, ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির"।** (সূরা আত তারমিম, আয়াত: ৯)

হে আল্লাহ! আমাদের নূর আমাদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে পূর্ণ করে দাও, আমাদের নূর তথা আমাদের নামাযকে সেই দ্রুতগতির বাহন বানিয়ে দাও যা আমাদেরকে তোমার সাক্ষাত লাভ করাবে এবং **"ইয়া আইয়াতুহান্নাফসুল মুতমাইন্না"** এই সুসংবাদ আমাদেরকে প্রদান করবে।

হযরত আকদাস মসীহে মাওউদ (আ.) বলেছেন: নামায খুব যত্নসহকারে সাজিয়ে-গুছিয়ে পড়া উচিত। নামায সকল উন্নতির মূলমন্ত্র এবং সকল সৌন্দর্য্যের উৎস। আর তাই বলা হয়েছে, 'নামায মোমেনের জন্য মে'রাজ'। ইসলাম ধর্মে লক্ষ লক্ষ আউলিয়া, গওস-কুতুব ও আবদাল গত হয়েছেন। তারা যেসব আধ্যাত্মিক মার্গ ও মর্যাদা লাভ করেছেন, এই খাঁটি নামাযের মাধ্যমেই তা অর্জন করেছেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন:

উচ্চারণ: **"কুররাতু আইনি ফিস সালাত"।**

অর্থাৎ: ''আমার চোখের স্নিগ্ধতা নামাযের মাঝেই নিহিত।''

প্রকৃতপক্ষে মানুষ যখন এই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয় তখন সমস্ত স্বাদ নামাযের মাঝেই মানুষ খুঁজে পায়। আর মহানবী(সা.)-এর উক্ত ইরশাদের অর্থ এটিই। অতএব নামাযের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার দিকে অগ্রসর হয়ে মানুষ অনেক বড় মর্যাদার অধিকারী হয়ে যায়।

হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) বলেন: 'যে ব্যক্তি বিনয় অবলম্বন করে আল্লাহ্‌র সম্মুখে ঝুঁকে যায়, আল্লাহ তা'লা এর বিনিময়ে জাগতিক রাজা-বাদশাহদেরকে তার সামনে বিনয়াবনত করে দেন। আর বাহ্যত নিঃস্ব ব্যক্তিকে সব কিছুর মালিকে পরিণত করে দেন।'

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সৌভাগ্য দিন, আমরা যেন এমন নামায আদায়কারী হতে পারি যা আমাদেরকে খোদার সাক্ষাত লাভ করাবে। আর আমরা যেন হযরত মুসলেহ মাওউদ(রা.) একটি আকাঙ্খা অনুযায়ী জীবন কাটাতে পারি। তিনি এক পংক্তিতে লিখেছেন:

উচ্চারণ: **"মাহমুদ উমর মেরী কাট জায়ে কাশ ইউঁহী,**

হো রুহ মেরী সাজদে মেঁ অওর সামনে খোদা হো।"

অর্থাৎ: হে মাহমুদ! এমন যদি হয়, আমার অন্তরাত্মা সিজদাবনত হয়ে থাকবে,

আর আমার সামনে স্বয়ং আল্লাহ উপবিষ্ট থাকবেন, এটি হবে আমার জীবনের পরম-প্রাপ্তি। (কালামে মাহমুদ, পৃ: ২৭৩)

এখন ইনশাআল্লাহ্ আমাদের সমাপনী দোয়া হবে। হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)-এর সেই সকল দোয়া যা জলসায় আগমনকারীদের উদ্দেশ্যে তিনি করেছিলেন তা আজকের এই জলসায় আগমনকারীদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা কবুল করুন। আপনারা যেসব দোয়া করবেন, উক্ত দোয়ার মাঝে আমাদের প্রিয় ইমাম, প্রিয় হুজুর (আই.)-কেও স্মরণ রাখবেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সকল দোয়া কবুল করুন। যেসব দোয়া তিনি বাংলার অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে করে থাকেন সেই সকল দোয়াও আল্লাহ্ কবুল করুন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে সেই সত্যিকার আন্তরিক পরিশ্রম করার সৌভাগ্য দিন যার ফলে আমাদের প্রিয় ইমাম আপনাদের মাঝে এসে উপস্থিত হতে পারেন। আপনারা যদি একটু চেষ্টা করেন এবং আপনাদের যোগ্যতার পূর্ণ ব্যবহার করেন আর আপনাদের সিজদাগাহ অশ্রুদ্বারা সিক্ত করেন তাহলে আমি নিশ্চিত বলতে পারি, আল্লাহ্ তা'লা সেই দিন অতি শীঘ্র আপনাদেরকে দেখাবেন, আমীন।

ভাষান্তর: **শেখ মোস্তাফিজুর রহমান,**
মুরব্বী সিলসিলাহ।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

আমার বন্ধু মৌলবী আবু সাঈদ মুহাম্মদ হুসায়ন বাটালভী সাহেব তাঁর এক পত্রে লিখেছেন যে তিনি হযরত মসীহ্‌র পার্থিব সশরীরে উত্থিত ও অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি বুদ্ধিবৃত্তিক ও যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করে দেখাবেন। কিন্তু কিছুই জানা গেল না, 'যৌক্তিকভাবে' বলতে মৌলবী সাহেব কী বোঝাতে চান? তিনি কি বেলুনে চড়ে আকাশের দিকে ওঠে পাঠক-দর্শকদের কোনো তামাশা দেখাতে চান? হযরত মৌলবী সাহেবের জন্য অত্যাবশ্যক, তিনি যেন বুদ্ধিবৃত্তিক যৌক্তিকতার কথা ভুলেও উচ্চারণ না করেন, যাতে দর্শন-বিজ্ঞান জানা লোকজন (কৌতুহলবশত) তাঁর চারপাশ ঘিরে না দাঁড়ায়। বরং তাঁর পক্ষে কেবল এ কথা বলাই অত্যাবশ্যক : 'যে-ব্যক্তি বুদ্ধিমত্তা ও যৌক্তিকতার নাম নেয় সে নির্ঘাৎ কাফির'। যদি ক'দিন এ রকম আকিদা-বিশ্বাসই বয়ে নিয়ে চলতে হয় তাহলে 'তাকফীর' তথা কাফির আখ্যা দেওয়া ছাড়া তাঁর কাছে কোন কার্যকর হাতিয়ার নেই। কিন্তু আমাদের তো এ বিষয়ে ঈমান (দৃঢ়বিশ্বাস) রয়েছে যে খোদা তা'লা মানুষের মাঝে যৌক্তিক বুদ্ধিমত্তার গুণ বৃথা সৃষ্টি করেন নি। মুসলমানদের মাঝে ইসলাম- ধর্মের শাখাবিশেষ কোন বিষয় নিয়ে (যা মৌলিক নয়) পরস্পর দ্বিমত পোষণকারী দু'টি দলের মধ্যকার একটি যদি এমন হয়, যারা শরীয়তের বিধানগত দলিল-প্রমাণ এবং পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আক্ষরিক মূল ভাষ্য সমূহ ছাড়া বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-প্রমাণও উপস্থাপনকারী হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে (শেষোক্ত) এ দলটিই সত্য। কেননা তাদের দাবীর সমর্থনে সাক্ষীরা সংখ্যায় ও গুণগত মানে অধিক ও ভারি। অতএব এখন লক্ষ্য করা উচিত, হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে কুরআন করীম, হাদীস ও বুদ্ধিমত্তা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা কীরূপ সক্রিয়ভাবে আমাদের সমর্থন করছে।

কিন্তু এসব সাক্ষীর কোনো একটিও আমাদের বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের এতটুকুও সমর্থন করে না। তারা কুরআন করীমের দ্বারে উপস্থিত হলে পবিত্র কুরআন বলে, 'আমার জ্ঞান-ভান্ডারে এইসব ধারণার সমর্থনোপযোগী কোনো তত্ত্ব-তথ্য নেই।' সেখান থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা যখন হাদীসাবলীর দিকে যায় তখন পবিত্র হাদীস বলে, 'হে উদ্ধত সম্প্রদায়! সামগ্রিক ও সামষ্টিকভাবে আমাদের দিকে দৃষ্টি দাও এবং "মু'মিন বি-বা'য" ও "কাফির বি-বা'য" তথা কিছু বিষয় মান্যকারী আর কিছু বিষয় অস্বীকারকারী সুলভ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ো না, যাতে তোমরা জানতে পার যে, পবিত্র হাদীসও কুরআন করীমের বিরোধী নয় (বরং সহী হাদীসও কুরআনকেই অনুসরণ করে–অনুবাদক)। এরপর হাদীসাবলী থেকে নিরাশ হয়ে তারা যখন 'সাল্‌ফ' ও 'খাল্‌ফ' তথা পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের বিভিন্ন মতামত সংবলিত উক্তিসমূহের দিকে ধাবিত হয় তখন সে-গুলোকে কেবল একটি কোনো নির্দিষ্ট ধারায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে পায় না। বরং এ সকল তফসীর বা ব্যাখ্যাকে তারা পক্ক-অপক্ক সবরকম বিষয়ের আকর রূপে দেখতে পায়। আর যখন তারা সুবিস্তৃত তফ্‌সীরগুলোতে খোঁজ করে যে 'ইন্নি মুতাওয়াফ্‌ফীকা"-আয়াতের কী অর্থ লেখা আছে?– তখন সর্বাগ্রে (বুখারী শরীফের তফসীর অধ্যায়) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসটিতে এর অর্থ 'ইন্নি মুমীতুকা' অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) মারা গেছেন বলে দৃশ্যমান হয়।

যখন তারা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির দিকে ধাবিত হয়, তখন (যুক্তি-প্রমাণমূলক) এক চপেটাঘাতে তাদের মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়। এরপর তারা স্বচ্ছ বিবেক ও (অন্তর্দৃষ্টিমূলক) আত্মিক জ্যোতির শরণাপন্ন হলে সেটিও তাদের ধাক্কা দিয়ে দূরে ঠেলে দেয়। অতএব এর চেয়ে অধিক বঞ্চনা আর কী-বা হতে পারে যে, এ লোকগুলোকে কেউ গ্রহণ ও সমর্থন করে না এবং কোনো জায়গায় তারা নিজেদের ঠাঁই খুঁজে পায় না।

তাদের মাঝে কিছু লোক চালাকি করে কুরআন করীমের স্বতঃস্পষ্টত প্রমাণসিদ্ধ বিষয়াদিকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে বলে থাকে, 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দটি অভিধানে একাধিক অর্থে এসেছে। অথচ সর্বান্তকরণে তারা জানেন, যে-সব শব্দকে স্বয়ং কুরআন করীম পরিভাষাগতভাবে বিশেষ অর্থে সীমাবদ্ধ করে দেয় এবং নিজ ধারাবাহিক বর্ণনা দ্বারা সুষ্ঠুভাবে বুঝিয়ে দেয় যে অমুক অর্থের জন্য পবিত্র কুরআন অমুক শব্দটিকে

নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সেই অর্থ থেকে ওই শব্দটিকে কেবল এজন্য অন্যাদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যে, কোনো অভিধানগ্রন্থে এর অন্য অর্থও রয়েছে–এটা নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য 'ইলহাদ' (প্রক্ষেপ)। উদাহরণস্বরূপ, অভিধান গ্রন্থাবলীতে অন্ধকার রাতকেও 'কাফির' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআনের সর্বত্র 'কাফির' শব্দটি নির্দিষ্টভাবে দ্বীন বা ধর্ম এবং ঐশী অনুগ্রহের 'কাফির' তথা অস্বীকারকারীর ওপরই প্রযোজ্য। এখন কেউ যদি পবিত্র কুরআনে এ শব্দটির প্রচলিত অর্থকে বাদ দিয়ে 'অন্ধকার রাত' অর্থে গ্রহণ করে আর এর প্রমাণ হিসেবে আভিধানিক গ্রন্থাবলী উপস্থাপন করে বলে যে, এগুলোতে এর এই অর্থও লিখা আছে, তাহলে সত্যি করে বলুন, এটা কি তার প্রক্ষেপমূলক আচরণ নয়? তেমনিভাবে আভিধানিক গ্রন্থাবলীতে 'সওম' শব্দটি কেবল রোযার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং খ্রিষ্টানদের গির্জাও 'সওম' নামে অভিহিত এবং উটপাখির পৃষ্ঠদেশকেও সওম বলা হয়। কিন্তু কুরআন করীমের পরিভাষায় সওম কেবল রোযারই নাম।

আর তেমনি 'সালাত' শব্দটির অর্থও অভিধানে একাধিক বটে। কিন্তু কুরআন করীমের পরিভাষায় কেবল নামায, দরূদ ও দোয়ার নাম 'সালাত'। এ বিষয়টি বুঝতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম এমন ব্যক্তিমাত্রই জানেন, প্রত্যেক বিদ্যা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখা এক এক পরিভাষার মুখাপেক্ষী এবং সেটির কর্ণধার ব্যক্তিবর্গ আবশ্যকতাবশত প্রয়োজন অনুযায়ী কতিপয় শব্দকে বিভিন্ন অন্যসব অর্থ থেকে পৃথক করে কোনো একটি অর্থে নির্ধারণ ও নির্দিষ্ট করে থাকেন। যেমন, চিকিৎসা বিদ্যার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করুন, বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দকে পরিভাষাগত ভাবে কেবল একটি অর্থে গৃহীত ও সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। স্বতঃসিদ্ধ চিরন্তন সত্য এটাই যে, কোনো বিদ্যা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানই পরিভাষা হিসেবে গৃহীত শব্দাবলী ছাড়া চলতে পারে না।

অতএব, যারা 'ইলহাদ' তথা প্রক্ষেপ করার ইচ্ছা পোষণ করে তাদের জন্য সোজা-সরল পথ এটাই যে, কুরআন করীমের অর্থ এর প্রচলিত পরিভাষামূলক শব্দাবলী অনুযায়ী গ্রহণ করা উচিত। নচেৎ সেটি মনগড়া রায় হবে। যদি বলা হয় যে, 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দের অর্থ যদি পবিত্র কুরআনে প্রচলিত শব্দাবলীতে সাধারণ ও সার্বিকভাবে 'রূহ কব্‌জ' তথা মানবাত্মাকে ধারণ করা তথা মৃত্যুদান হত, তাহলে তফসীরকারগণ এর বরখেলাফ ও বিপরীত উক্তিসমূহ কেন লিখলেন?

এর উত্তর হলো, মৃত্যুর অর্থও তো তারা বরাবর লিখে এসেছেন। উল্লিখিত অর্থের ওপর যদি একটি জনগোষ্ঠীর 'ইজমা' (তথা সর্বসম্মত ঐকমত্য) না হতো তাহলে কেনই-বা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত তেরো শ' বছরব্যাপী উল্লিখিত অর্থ তফসীরগুলোতে লিপিবদ্ধ হয়ে আসলো? অতএব উল্লিখিত এ অর্থ নিরবচ্ছিন্ন ধারায় লিপিবদ্ধ হয়ে চলে আসার বিষয়টি সুস্পষ্টত এর প্রমাণ বহন করে যে, সাহাবা কিরামের যুগ থেকে আজ অবধি উল্লিখিত অর্থের ওপর 'ইজমা' তথা ঐকমত্য স্বীকৃত হয়ে এসেছে। তবু যদি এ প্রশ্ন করা হয় যে, এরই সাথে অন্যান্য অর্থ কেন লিপিবদ্ধ করা হলো? এর উত্তর হলো, অন্যান্য সব অর্থ কতিপয় ব্যক্তির ভুল ও অসত্য মতামত বটে। এসব মতামতের অসত্যতা প্রমাণ করার জন্য এটা যথেষ্ট যে, এসব মতামত কুরআন করীমের অভিপ্রায় ও স্পষ্ট বর্ণনার পরিপন্থী। আর সেই সাথে এ-ও বলা যায়, তাদের মাঝে কতক সেইসব লোকও আছেন যারা এই মত পোষণ করেন যে, হযরত ঈসা তিন বা সাত ঘন্টা বা তিন দিন মৃতাবস্থায় থাকেন এরপর তাঁকে পুনর্জীবিত করে আকাশে ওঠানো হয়। বস্তুতপক্ষে এ অভিমত সম্পর্কে যৎসামান্য দৃষ্টি নিক্ষেপে প্রতীয়মান হয় যে, যারা শুরুতে উল্লিখিত রায় অবলম্বন করেন তাদের এ অভিপ্রায় থাকতে পারে– যেমন কিনা কতক হাদীসে এসেছে এবং মৌলবী আব্দুল হক দেহলভীও (প্রখ্যাত তফসীর লেখক) এ প্রসঙ্গে তাঁর পুস্তকাবলীতে অনেক কিছু লিখেছেন এবং সূফীপন্থীগণও অনুরূপভাবে একই মতানুসারী যে, প্রত্যেক পবিত্র ও সত্যপরায়ণ বান্দা মারা গেলে মৃত্যুর পরেপরে তাঁকে জীবিত করা হয় এবং ঐশী কুদরতে তাঁকে এক প্রকার জ্যোতির্ময় দেহ দান করা হয়, আর এই দেহসহ তিনি আকশে নির্ধারিত তাঁর পদমর্যাদা অনুযায়ী অবস্থান গ্রহণ করে থাকেন।

অতএব, হযরত মসীহ্ (আ.)-কে মাটির দেহ সহ আকাশে ওঠানোর এক অদ্ভুত ও অভিনব নিয়মবিধি কেন তৈরী করা হয়?! আমরা মানি ও স্বীকার করি যে একটি নূরানী (জ্যোতির্ময়) দেহ সহ তাঁকে আকাশের দিকেও ওঠানো হয়েছিল যেভাবে অন্যান্য সব নবীকেই ওঠানো হয়েছে। আর হয়েছে বলেই তো তাঁরা খাবার খাওয়া ও পানি পান করার এবং পায়খানা-প্রস্রাবের মুখাপেক্ষী হন না। আর তাই হযরত মসীহকে যদি এ স্থুল ও পার্থিব দেহ দেয়া হতো তাহলে আকাশে তাঁর জন্য একটি পাকশালা ও একটা পায়খানাও আবশ্যকীয় হতো। কেননা এরকম দেহবিশিষ্ট যে-কারও জন্য খোদা তা'লা এ যাবতীয় বিষয় ও উপকরণ অপহার্যভাবে নির্ধারণ করেছেন, যেমন কিনা কুরআন করীমের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ থেকে প্রতিভাত।

হে সম্মানিত মৌলবী সাহেবান! যখন সাধারণভাবে কুরআন করীম থেকে হযরত মসীহ্‌র মৃত্যু প্রমাণিত এবং সূচনাকাল থেকে আজ অবধি সাহাবা কিরাম এবং মুফাস্‌সিরগণ তাঁর মৃত্যুই সাব্যস্ত করে এসেছেন তখন আপনারা কিসে না-হক জেদ ধরেছেন?! খ্রিষ্টানদের খোদাকে কোথাও (কোনোভাবে) মরতে তো দিন! কত দিন আর তাঁকে চির জীবিত (মৃত্যুঞ্জয়ী) বলেই যাবেন?! হায়! কোথাও তো এর ইতি টানা উচিত। তবুও আপনারা যদি জেদের বশবর্তী হয়ে বলেন যে, মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম মারা তো অবশ্যই গিয়েছিলেন তবে এ মাটির দেহেই তাঁর আত্মা ফিরে এসেছিল, তাহেল এর কি কোথাও কোনো প্রমাণও আছে?

তাছাড়া এমতাবস্থায় তাঁর জন্য আপনারা কি দু'টি মৃত্যু সাব্যস্ত করবেন? এটা কোথায় লেখা আছে এবং কার এই নির্দেশনা যে, তার ক্ষেত্রে খোদা তা'লা 'মওতাতুল-উলা' (প্রথম মৃত্যু)-কে যথেষ্ট বলে নির্ধারণ করবেন না? এবং সারা জাহানের জন্য (কেবল) একটি মৃত্যু আর নির্দোষ মসীহ্ (আ.)-এর ওপর দু'টি মৃত্যুর কষ্ট ন্যাস্ত হবে?! উল্লিখিত 'দু'টি মৃত্যু' সম্পর্কে কি কোনো হাদীস বা কুরআনের কোনো আয়াত আছে?

এমনিতে তো আপনারা হযরত মসীহ্‌র মরদেহকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে দাফন করতে চান–যখন আপনারা বলে থাকেন যে, আমাদের মনিব ও অভিভাবক নবী করীম (সা.)-এর কবরে হযরত মসীহ্‌র মরদেহকে সমাহিত করা হবে। কিন্তু আপনারা এটা চিন্তা করেন না যে উল্লিখিত দ্বিতীয়বার তাঁকে এই মৃত্যু তাঁর কোন্ গুরুতর গোনাহ্‌র শাস্তিস্বরূপ দেয়া হবে?! আর জানা আবশ্যক যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র কবরটিতে আখেরী যুগে হযরত মসীহ্‌র সমাহিত হওয়া তো একথার শাখাবিশেষ যে, প্রথমে তাঁর এই ভৌতিক দেহসহ তাঁকে আকাশে উঠানো হয়েছিল বলে প্রমাণিত হয়।

নচেৎ ওই হাদীসটিকে যদি সহীহ্ বলেই ধরে নেয়া হয় এবং এর অর্থ বাহ্যিক ও আক্ষরিক বলেই স্বীকার করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রেও সম্ভবত হযরত মসীহ্‌র এমন কোন 'সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি' হবেন যিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র সমাধির পার্শ্বে সমাহিত হবেন। কেননা 'উলামাউ উম্মাতি কা-আম্বিয়ায়ে বনী ইসরাঈল' [(অর্থাৎ, 'আমার উম্মতের উলামা বনি ইসরাঈলের নবীগণের তুল্য'–অনুবাদক)–হাদীস অনুযায়ী আগমনকারী 'সদৃশ ও প্রতিচ্ছবি'গণের কম্‌তি নেই। আর তেমনি এ মহান আয়াতটিও 'সদৃশ ও প্রতিচ্ছবিদের' দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে:

'ইহ্‌দিনাস্ সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল-লাযিনা আন্ 'আম্‌তা আলাইহিম।"

[অর্থাৎ, 'আমাদের তুমি সরল-সঠিক পথে পরিচালিত কর। যাদের তুমি পুরস্কারে ভূষিত করেছ তাদের পথে' (সূরা ফাতিহা) –অনুবাদক]। আর তেমনি জোরালো যুক্তি-প্রমাণের কারণে প্রথমোক্ত হাদীসটিকে এর শুদ্ধতার শর্তসাপেক্ষে এক 'ইস্তিআরা' (তথা রূপকাবৃত বিষয়) স্বীকার করে নিয়ে এর এ-ও অর্থ হতে পারে যে, তাঁর (সা.) আত্মিক সঙ্গলাভ ও তাঁর সাথে একীভূত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ শত্রু হলে তার ক্ষেত্রে মানুষ বলে থাকে, 'তার কবরও যেন আমার ধারে-কাছে না হয়।'

কিন্তু বন্ধুর ক্ষেত্রে সে তার কবরের সান্নিধ্যও আকাঙ্ক্ষা করে। অতএব কাশ্‌ফসমূহে প্রায়শ অনুরূপ বিষয়াদি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এক দীর্ঘকাল আগের কথা, এ অধম স্বপ্নে দেখে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 'রওযা-মুবারকে (পবিত্র সমাধিস্থলে) এ অধম দাঁড়িয়ে আছে এবং কতক ব্যক্তি মারা গেছে অথবা নিহত হয়েছে তাদেরকে মানুষ দাফন করতে চায়। এমতাবস্থায় রওযা মুবারক থেকে এক ব্যক্তি বেরিয়ে আসেন। একটি নলখাগরা তার হাতে রয়েছে। সে ঐ নলখাগরা দিয়ে মাটিতে আঘাত করছিল আর তাদের মধ্যকার প্রত্যেককে লক্ষ করে বলছিল, 'তোমার এখানে কবর হবে।' 'তোমার এখানে কবর হবে।' সে ওভাবেই নলখাগরা মাটিতে আঘাত করতে করতে আমার কাছে এল এবং আমাকে দেখিয়ে ও আমার সামনে দাঁড়িয়ে পবিত্র 'রওযার পার্শ্বের মাটিতে সে তার নলখাগরা দিয়ে আঘাত করে বল্‌ল, 'এ জায়গাটিতে তোমার কবর হবে।' তখনই জেগে যাই। আমি আমার 'ইজতিহাদে' এর এই তা'বির (ব্যাখ্যা) করলাম যে, এটিতে 'পরকালীন সঙ্গ লাভের দিকে নির্দেশদান করা হয়েছে। কেননা যে ব্যক্তি মারা যাবার পর আধ্যাত্মিকভাবে কোনো 'মুকাদ্দাস' তথা অতি পবিত্র বান্দার নিকটে উপনীত হয় তখন অন্য কথায় তাঁর কবর ঐ পবিত্র বান্দার কবরের অতি নিকটে অবস্থান লাভ করে। ওয়াল্লাহু আ'লামু ওয়া ইল্‌মুহু আহ্‌কাম।' (অর্থঃ আল্লাহ্ তা'লা সবচে' ভাল জানেন এবং তাঁর জ্ঞানই সবচে' উৎকৃষ্ট– অনুবাদক)।

(চলবে)

ভাষান্তর: **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

লাল চায়ের শতগুণ

সংগ্রাহক: **কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী**

'লিকার বেশী চিনি কম
চা খান গরম গরম'

চা প্রায় সবারই প্রিয় পানীয়। নিত্য ২/৩ কাপ চা পান না করলেই যেন হয় না। গায়ে শক্তি অনুভব করে না। দেহের অলসতা কাটে না। এক কাপ চায়ের সাথে কিছু গপ্প না করলেই যেন নয়। এখন প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সহজেই টাটকা গরম চা মিলে। ফলে চা পানকারী মানুষের সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তা ছাড়া গাছের নীচে, ক্ষেতের আইলে, শহরের অলি-গলিতে কেতলীতে গরম চা নিয়ে ফেরিওয়ালা খাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চেচায়– 'টাটকা গরম চা'। সুতরাং চা পান না করে আপনার নিস্তার কোথায়? সাথে আছে এর চেয়েও বেশী দামী 'কফি'।

কিভাবে চা পান করলে আমরা কি কি উপকার পেতে পারি তা নিয়ে এখন কিছু কথা– চিনি ছাড়া চা পান করাই উত্তম। বেশী চিনিতে অনেককে অনেকভাবে রোগে আক্রমণ করে। তাই চিনিকে উপেক্ষা করাই ভাল। চিনি ছাড়া চা চোখের জন্য উপকারী। এমন চা চোখকে ভাল রাখে এবং চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়। বলতে কী, চোখের যাবতীয় সমস্যা দূরীকরণে চায়ের জুরি নেই। প্রাতে ঘুম থেকে উঠে চিনিহীন চা পান করলে প্রায় সারাটা দিনই এনার্জি পাওয়া যায়, শরীরটা চাঙ্গা থাকে। কারণ লাল চায়ে আছে ক্যাফেইন, কার্বোহাইড্রেট, পটাশিয়াম, মিনারেল, ক্লোরাইড, ম্যাঙ্গানিজ ও পলিকেনল। এ ছাড়াও এতে আছে এন্টি-অক্সিডেন্ট, ট্যানিন, গুয়নিন, এক্সথিন, পিউরিন যা শরীরের জন্য উপকারী। তবে বেশী বেশী চা পান করা নিষেধ। পরবর্তীতে তা অপকারে পরিণত হবে। দিনে কোন ভাবেই ৩/৪ কাপ লাল চা এর বেশী/ কাপ চা পান উচিত নয়।

লাল চায়ের গুণ
এখানেই শেষ নয়–
আরো আছে শুনুন।

সম্প্রতি চক্ষু বিশেষজ্ঞগণের গবেষণায় জানা গিয়াছে যে, দিনে একবার লাল চা পান করলে প্রায় ৭৫ শতাংশ গ্লুকোমার মত চোখের সমস্যার নিরসণ হয়। গ্লুকোমা রোগে আক্রান্ত হলে চোখের অভ্যন্তরে চাপ বৃদ্ধি পায় ফলে অপটিক নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দৃষ্টশক্তি হ্রাস পেতে থাকে। লাল চায়ের সাথে দৃষ্টি-শক্তির ভাল-মন্দের সরাসরি যোগসূত্র আছে। কারণ লাল চায়ে আছে– এন্টি-অক্সিডেন্ট, এন্টিইনফ্লেমেটরি প্রপাটিজ এবং নিউরো প্রোটেকটিভ ক্যামিকেল যা চোখকে ভাল রাখতে সাহায্য করে। তবে কেবল চোখই নয়, চিনি ছাড়া লাল চায়ে রয়েছে আরো আরো গুণ। লাল চা হজম শক্তি বাড়ায়। ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে। হার্ট সতেজ রাখে। স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি করে। রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বাড়ায়, শরীরের ওজন কমায়, হাড় শক্তিশালী করে এবং ত্বকের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করে।

বন্ধুগণ! তা হলে চলুন চা পান করি তবে দুধ-চিনি ছাড়া "লাল চা"। প্রচন্ড কনকনে শীতে এক কাপ চা আসলেই বস্ত্রহীন মানুষগুলির দেহটাকে দীর্ঘক্ষণ গরম রাখতে সাহায্য করে। এখানেও চায়ের গুণের কথা অনস্বীকার্য।

দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকার সৌজন্যে

সাদাকাতে মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও ২৩ মার্চ

মাহমুদ আহমদ সুমন

হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার প্রতি ১৮৮১ সনে মামুরিয়াতের (প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার) প্রথম ইলহাম হয়। ইলহামটি হলো:

কুল ইন্নি উমেরতু ওয়া আনা আওওয়ালুল মুওমেনিন অর্থাৎ- তুমি বল, আমি প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম ঈমান এনেছি। ১৮৮২ সনে বারাহীনে আহমদীয়া প্রকাশের মাধ্যমে এই ঘোষণা মানুষ জানতে পারে। তারপর ২৩ মার্চ ১৮৮৯ সনে লুধিয়ানাতে সূফি আহমদ জান সাহেব-এর বাড়ীতে তিনি ইমাম মাহদী হিসেবে প্রথম বয়াত নেন। তাই আহমদীয়া জামাতে ২৩ মার্চের গুরুত্ব অনেক ব্যাপক। ১৯০১ সনে তিনি তাঁর জামাতের নাম "জামাতে আহমদীয়া" রাখেন। ২৬ মে ১৯০৮ সনে তিনি লাহোরে ইন্তেকাল করেন। ২৭ মে ১৯০৮ সনে কাদিয়ানের বেহেশ্‌তি মাকবেরাতে তিনি মদফুন হোন। এভাবে মামুরিয়াতের দাবীর পর দীর্ঘ ২৭ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। সূরা হাক্কার ৪৫ থেকে ৪৭ নং আয়াত তাঁর দাবীর সত্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এখন একটু ভেবে দেখুন, আল্লাহ্ তা'লা রসূলে করীম (সা.) সম্বন্ধে কত কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন যে, তিনি যদি নিজ থেকে কোন আয়াত রচনা করে বলতেন যে, এটি আল্লাহ্‌র বাণী। অথচ তা আল্লাহ্‌র বাণী না, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা নিজেই তাকে কঠোর হস্তে দমন করতেন, পাকড়াও করতেন, চরম শাস্তি দিতেন, তার জীবন শিরা কেটে দিতেন। জীবন শিরা কাটার অর্থ কি? একেবারে ধ্বংস করে দেয়া, নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। এখান থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামে যদি মিথ্যা দাবী করে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি বাণী নাযেল করেন নাই, কিন্তু সে দাবী করছে যে, নাযেল করেছেন। দেখুন, যেখানে আল্লাহ্ বলছেন যে, যদি হযরত মুহাম্মদ (সা.)ও এমন ভয়ানক অপরাধ করতেন (নাউযুবিল্লাহ্) তবু তাঁর শাস্তি! অনিবার্যরূপে ধ্বংস। তার চেয়েও বড় লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, শাস্তি দেবার কাজটা স্বয়ং আল্লাহ্ নিজ হাতে রেখেছেন। কোন মৌলভী সাহেবদের উপর এই দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন নি। আজ আমাদের বিরোধী আলেমরা উঠে পড়ে লেগেছেন, অবিরাম হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন যে, তারা মির্যা সাহেবের বিনাশ করেই ছাড়বেন। বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, আল্লাহ্‌র কাছে তারা কি উত্তর দিবেন? তারা কুরআনের কোন্ আয়াত বা কোন্ হাদীসে পেলেন যে, যাকে তারা ভন্ড দাবীদার বলে মনে করে তাকে তারাই শায়েস্তা করবে, শাস্তি দিবে, জ্বালাবে, পোড়াবে এবং তার সর্বনাশ করবে?

এমন এক ব্যক্তি যে বলে যে, 'আল্লাহ্ আমার উপর তাঁর কালাম নাযেল করেছেন'। অতঃপর সে ঐ সব বাক্য প্রকাশ ও প্রচার করে, আর কোন মতেই এ সমস্ত কালাম প্রচার ও প্রকাশে বিরত হয় না, আর আল্লাহ্‌র নামে কসমও খায়। আল্লাহ্‌র শপথ নিয়ে আযাবের শর্ত রেখে কসম খেয়ে প্রচার করে যে, ইহা আল্লাহ্‌র কালাম বা আল্লাহ্ আমাকে ওহী করেছেন এবং বহু অত্যাচার সত্বেও সে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলে যে আমাকে যতই শাস্তি দাও আমি আমার দাবী থেকে বিরত হব না। আর তার ইলহামের মধ্যে এ ধরণের ইলহামও থাকে যে, আল্লাহ্ তাকে বিজয় দান করবেন এবং আল্লাহ্ তাকে সকল প্রকারের আক্রমণ থেকে বাঁচাবেন, আর এমন ইলহামও থাকে যে, তাঁর বিরোধীদেরকে আল্লাহ্ সফলতা দিবেন না। বরং তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। আর যদি কালক্রমে ঐ সব ইলহাম পূর্ণও হতে দেখা যায় অর্থাৎ এই দাবী কারক যদি দিন দিন উন্নতি লাভ করতে থাকে আর লোকেরা ধীরে ধীরে তাকে গ্রহণ করতে থাকে, আর যারা তাকে সত্য বলে গ্রহণ করে তাদের উপর শক্ত জুলুম-অত্যাচার করলেও তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে না, বরং যারা ঐ দাবীদারকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করে তারাই যদি বার বার ব্যর্থ হয় এবং সমাজে লাঞ্ছিত হয়, সে ক্ষেত্রে আপনারা কি ফয়সালা দিবেন? একটু চিন্তা করে দেখুন।

এমন দাবীদার যদি বার বার বিরোধীদের তুমুল আক্রমণ থেকে বেঁচে যায়, আর কোন প্রকাশ্য শক্তি তাকে সাহায্য করছে, এমন প্রমাণও না পাওয়া যায়, আর এই দাবীকারকের হাজার হাজার ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণী যথা সময়ে পূর্ণ হতে থাকে, আর তিনি সুদীর্ঘ ২৩ বছরেরও বেশী কাল সসম্মানে জীবন-যাপন করে পরিপক্ক বয়সে স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু বরণ করেন; তাহলে ঐ ক্ষেত্রে কি করে আপনি বলবেন যে, সে ভন্ড বা মিথ্যা দাবীদার? তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর খেলাফত জারী রয়েছে। বর্তমানে ৫ম খেলাফত চলছে এবং তাঁর জামাত অতি দ্রুত প্রসার লাভ করছে, কোটি কোটি পথহারা মানুষ আজ তাকে সত্য যাচাই করে গ্রহণ করছে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, এমন ভন্ড মিথ্যা দবীদারকে আমি এমন কঠোর শাস্তি দেই যে, কেউ তাকে আমার আযাব থেকে বাঁচাতে পারে না। এমন কি যদি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)ও এই দোষে দোষী হতেন তবুও তাকে ছাড় দেয়া হতো না! এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পর হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ২৩ বছর জীবিত ছিলেন। এরপর যদি কোন ব্যক্তি প্রতিশ্রুত মাহদী হবার দাবী করেন। অতঃপর উল্লিখিত উপায়ে ২৩ বছরের বেশী কাল জীবিত থাকেন। তবে তাঁকে কোন্ যুক্তিতে অস্বীকার করবেন? আর যদি অস্বীকার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তবে খুব চিন্তা করে দেখুন, এমনটি করায় আলোচ্য আয়াতকে কাফেররা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার বিপক্ষে ব্যবহার করতে পারার সুযোগ সৃষ্টি হয় নাকি? তারা বলতে পারে যে, হযরত রাসূল (সা.) আল্লাহ্ তা'লার বাণী প্রাপ্ত হবার দাবীর পর ২৩ বছর জীবিত ছিলেন, আর মির্যা সাহেবও তদ্রুপ। এখন মির্যা সাহেব যদি সত্য না

হোন তবে হযরত রসূল (সা.)-এর সত্যতার কি প্রমাণ রইল?

মহান খোদা তা'লা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-কে প্রত্যাদিষ্ট করে হাজার হাজার ইলহাম নাযেল করেছিলেন। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন: "হে আহমদ! আল্লাহ্ তোমার মধ্যে বরকত রেখেছেন। তুমি যা চালিয়েছ, তা তুমি চালাও নাই বরং আল্লাহ্ চালিয়েছেন। ...তুমি বল, আমি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি। এবং আমি সর্ব প্রথম ঈমান এনেছি। ...তুমি বল, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা পালিয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা (বাতিল) পলায়ন করারই কথা। ...সমস্ত বরকত মুহাম্মদ (সা.) থেকে ...তোমার প্রতি যারা হাসি বিদ্রুপ করবে আমরা তাদের জন্য যথেষ্ট! ...আমরা নিশ্চয় তোমাকে বিজয় দান করব, প্রকাশ্য বিজয়!..." (বারাহীনে আহমদীয়া-৩য় খন্ড)।

আল্লাহ্ তা'লা আরো বলেন, "দুনিয়া মে এক নাযির আয়া পর দুনিয়া নে উসে কবুল না কিয়া, লেকিন খোদা উসে যরুর কবুল কারেগা আওর বাড়ে যোর আওয়ার হামলোঁ সে উসকি সাচ্চায়ী যাহের কারেগা"–অর্থাৎ পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছেন, পৃথিবী তাকে গ্রহণ করেনি, পরন্তু আল্লাহ্ তাকে গ্রহণ করবেন এবং মহাপরাক্রমশালী আক্রমণ সমূহ্ দ্বারা তার সত্যকে প্রকাশ করবেন। আল্লাহ্ তা'লা আরো ইলহাম করেন "I love you, I shall give you a large party of Islam." –এ ধরণের হাজার হাজার ইলহাম হযরত মসীহ মাওউদ ও মাহদী (আ.) এর উপর নাযেল হয়েছে বলে তিনি দাবী করেছেন এবং যথা সময়ে এই সব ইলহাম তিনি প্রচারও করতে থাকেন। আর এই সমস্ত ইলহামের পবিত্র বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে, আজও হচ্ছে এবং হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

অনেকভাবেই হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা যাচাই করা যায়। কারণ যে জিনিষ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তা অনেক ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। আমরা জানি, এই দুনিয়াতে মানুষ সাধারণত 'ইলমুল ইয়াকীন' দ্বারাই বিশ্বাস আনয়ন করে থাকেন, তাই আসুন এই পন্থায় হযরত মির্যা সাহেব এর সত্যতাকে যাচাই করি।

পবিত্র কুরআন থেকে বিশ্বাস অর্জনের তিনটি রাস্তা পাওয়া যায়। (১) ইলমুল ইয়াকীন (২) আইনুল ইয়াকীন ও (৩) হাক্কুল ইয়াকীন।

(১)ইলমুল ইয়াকীন: কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা এই জ্ঞান অর্জন করে থাকি যে ইসলামে এক চরম অধঃপতনের যুগ আসবে, সেই অধঃপতন থেকে উদ্ধারের জন্য হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আসবেন। এখন চিন্তার বিষয় আমরা বর্তমান কোন যুগে বাস করছি।

(২)আইনুল ইয়াকীন: আজ আমরা নিজ চোখে দেখলাম যে, রসূল করীম (সা.) ইমাম মাহদী (আ.) সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তা এক এক করে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। যেমন– (১) মিথ্যার প্রাদুর্ভাব (ইমাম মাহদী (আ.) এর যুগের প্রধান লক্ষণ)। (২) নারীদের মধ্যে নগ্নতার আধিক্য (নারীর পর্দা নাই)। (৩) নারীর অধিকার আদায়ের নাম অসহিষ্ণুতার প্রসার (৪) নর্তকী ও গায়িকাদের প্রাধান্য। (৫) জাতির নেতা ছোট লোক হবে। (৬) খৃষ্টানদের প্রাধান্য হবে। (৭) ইসলামের কেবল নাম থাকবে। (৮) কুরআনের কেবল অক্ষর থাকবে। (৯) মসজিদ সুন্দর হবে কিন্তু হেদায়াত শূন্য হবে। (১০) কতক আলেম আকাশের নিকৃষ্টতম জীব হবে (যারা ফিৎনা ছড়াবে) (মিশকাত)।

প্রশ্ন উঠে, নিদর্শনাবলী সব পূর্ণ হয়ে গিয়ে থাকলে সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি কোথায়? আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) যখন বললেন আর কুরআনও এই ব্যাপারে বলে তা হলে সেই প্রতিশ্রুত ব্যক্তি কোথায়? আজ দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজ খানা কা'বা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, তাই নিশ্চিত ইমাম মাহদী (আ.) এসেছেন। এছাড়া তাঁর সত্যতার জলন্ত আরেকটি প্রমাণ হলো চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ। যেভাবে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন:-

নিশ্চয় আমাদের মাহদীর সত্যতার এমন দুইটি লক্ষণ আছে যা আকাশ মন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত অন্য কারও সত্যতার নিদর্শন রূপে প্রদর্শিত হয় নাই। একই রমযান মাসে (চন্দ্র গ্রহণের) প্রথম রাত্রিতে চন্দ্র গ্রহণ হবে এবং (সূর্য গ্রহণের) মধ্যম তারিখে সূর্যগ্রহণ হবে" (দারকুতনী-১৮৮ পৃ.)।

হাদীসে বর্ণিত এই নিদর্শন থেকে স্পষ্টই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিদর্শন। এ ধরণের নিদর্শন প্রদর্শন করা অন্য কোন শক্তির দ্বারা সম্ভব নয়। আর হযরত মুহাম্মদ (সা.) অবশ্যই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে জ্ঞান লাভ করেই এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। অতএব, তিনি আল্লাহ্‌র সত্য নবী ছিলেন। এ থেকে অকাট্য ভাবে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যে যুগে এই অসাধারণ নিদর্শন প্রদর্শিত হবে, নিঃসন্দেহে সেটা হযরত মাহদী (আ.)-এর যুগ। আজ সারা পৃথিবীর জন্য, বিশেষ ভাবে মুসলমানদের জন্য এ এক সুসংবাদ যে, উক্ত নিদর্শন ইতোমধ্যেই ঘটে গেছে। পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধে ১৮৯৪ ইংরেজী সালে এবং পশ্চিম গোলার্ধে ১৮৯৫ ইং সালে। বলা বাহুল্য, ঐ যুগে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ব্যতীত অন্য কোন দাবীদার ছিল না এমন কি আজও এমন কোন দাবীকারক ময়দানে দাঁড়ায় নাই। আরো উল্লেখযোগ্য বিবেচ্য বিষয় এই যে, এই নিদর্শন প্রকাশ পাওয়ার পাঁচ বছর পূর্বে তিনি দাবী করেছিলেন যে, তিনিই প্রতিশ্রুত মাহদী। তখন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে, তাঁর দাবীর পাঁচ বছর পরে এই নিদর্শন প্রকাশ হবে এবং হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর দাবী সত্য প্রমাণিত হবে। আল্লাহু আকবার। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আলেম সমাজের বড় অংশ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর বিরোধিতা করাটাই ঈমানের তাগিদ বলে ধরে নিলেন। আর সর্বপ্রকার বিরোধিতা আরম্ভ করলেন, কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না।

(৩)হাক্কুল ইয়াকীন: উপরোক্ত নিদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে একমাত্র হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)কেই আমরা সত্যবাদী দেখতে পাই। কেননা তিনিই এক মাত্র দাবী কারক। তিনি খোদার কসম খেয়ে ইমাম মাহদী হওয়ার দাবী করেছেন এবং তার দাবীর পরবর্তী কালেও বর্ণিত ওই সব নিদর্শনকে আমরা পূর্ণ হতে দেখছি।

প্রিয় বন্ধুগণ, হযরত ইমাম মাহদীর সত্যতার লক্ষণ পবিত্র কুরআনের আলোকে আরো বিস্তারিত তুলে ধরছি। যাতে তাঁর সত্যতা সম্পর্কে আর কোন দ্বন্দ্ব না থাকে। সত্যতা যাচাই করার জন্য দাবীকারকের কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে, যেমন (ক) দাবীর পূর্ববর্তী জীবন, (খ) দাবীর পরবর্তী

জীবন এবং (গ) তাঁর মৃত্যু পরবর্তী কালে তাঁর কৃত দাবীগুলোর বিকাশ।

(১) নবীর নবুয়তের দাবীর পূর্বের জীবন পবিত্র হয়। যেমন পবিত্র কুরআন শরীফে (সূরা ইউনুস-১৭) আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

অর্থাৎ- ইতিপূর্বে নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে এক দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছি, তবুও কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাবে না?

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মক্কাবাসীদের বললেন, "হে লোক সকল! আমি তোমাদের মধ্যে আমার জীবনের এক দীর্ঘকাল কাটিয়েছি। আমার দাবীর পুর্বের বিগত ৪০ বছর পর্যন্ত আমার স্বভাব চরিত্র, চাল-চলন দেখেছো, তারপর আমার সম্বন্ধে তোমরা কি ধারণা পোষণ কর? আমি কি সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী? আমি যদি এত কাল সত্যবাদী ছিলাম, তবে আজ এই পৌঢ় বয়সে কি করে মিথ্যাবাদী হয়ে গেলাম? আজ এই বয়সে আমার মিথ্যা বলার কি প্রয়োজন ছিল?"

অর্থাৎ এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা হযরত রসূলে করীমের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ এটা উল্লেখ করলেন যে, তিনি দাবীর পূর্বে পরম সত্যবাদী ছিলেন। আর দাবীর পূর্বের সত্যবাদীতা, তার দাবীর সত্যতার পক্ষে একটি শক্তিশালী দলিল। অতএব আমরা এথেকে জানতে পারলাম যে, আল্লাহ্ যাঁদের নির্বাচিত করে (মামুর করে) পাঠান, তাঁদের দাবীর পূর্বের জীবন-চরিত নিষ্কলুষ ও পবিত্র হয়ে থাকে। এই নিয়ম অনুসারে যেমন দেখা যায় যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্যবাদীতার কথা তাঁর শত্রুতারও স্বীকার করতেন। ঠিক তেমনই ঘটনা ঘটেছে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সময়। হযরত মির্যা সাহেবের স্বভাব-চরিত্রও ছিল নিষ্কলুষ এবং পাক-পবিত্র। তাঁর চরিত্র সম্পর্কে ঘোর বিরোধিরাও প্রকাশ্য স্বীকারাক্তি দিতেন যে তিনি কেমন পবিত্র প্রকৃতির ছিলেন। হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর কয়েকজন ঘোর বিরোধীদের উক্তির দিকে লক্ষ্য করুন:-

* মৌলানা জাফর আলী খান, সম্পাদক, জমিন্দার পত্রিকা। তিনি হিন্দুস্থানের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। যিনি আজীবন আহমদীয়া জামাতের বিরোধিতা করে গেছেন। তাঁর পিতা মৌলভী সিরাজুদ্দীন সাহেব সাক্ষী দিয়েছেন: "মির্যা গোলাম আহমদ ১৮৬০/৬২ ইং সালে সিয়ালকোটে চাকরীরত ছিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২২/২৩ বছর। আমি স্বচক্ষে দেখে সাক্ষী দিচ্ছি যে, "তিনি যৌবনে একজন খুবই সালেহ এবং বুযুর্গ ছিলেন।" (জমিন্দার, ৮ই জুন, ১৯০৮)

* আহমদীয়া জামাতের অন্যতম বিরোধী নেতা মৌলভী মোহাম্মদ হোসেইন বাটালভী লিখেছেন: "বারাহীনে আহমদীয়ার লেখক [(হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)] আমাদের স্বপক্ষ ও বিপক্ষীয় সকলের অভিজ্ঞতা অনুসারে শরিয়তে মুহাম্মদীয়ার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত এবং পরহেযগার ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন"। (এশায়াতুস সুন্নাহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৯ম সংখ্যা)।

* তিনি আরো বলেছেন: "বারাহীনে আহমদীয়ার লেখক ইসলামের এমন একজন সেবক ছিলেন, যিনি তাঁর জান, মাল, লিখনী, বক্তৃতা দিয়ে ইসলামের খেদমতে সুদৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। যার তুলনা ইতিপূর্বে মুসলিম জাহানে খুবই বিরল।" (এশায়াতুস সুন্নাহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৭ম সংখ্যা)।

আর হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) দাবীর সাথে বলেছেন: "তোমরা আমার বিগত জীবনের (চরিত্র) উপর কোন প্রকার কলঙ্ক, মিথ্যা রচনা, মিথ্যাবাদিতা বা ধোকাবাজির অপবাদ বা অভিযোগ আনতে পারবে না। যার ফলে বলতে পারবে যে, এই ব্যক্তি অতীতেও মিথ্যা বলা বা মিথ্যা রচনায় অভ্যস্থ। অতএব তার এ দাবীও মিথ্যা। তোমাদের মধ্যে কে আছে যে আমার চরিত্রের উপর কোন কলংকের দাগ দেখাতে পারে? সুতরাং এটা আল্লাহ্‌র ফজল (কৃপা) যে, তিনি আমাকে প্রথম থেকেই তাকওয়ার উপর কায়েম রেখেছেন। এবং চিন্তাশীলদের জন্য এটা একটা নিদর্শন" (রূহানী খাযায়েন, ২০তম খন্ড, পৃ. ৬৪)।

অতএব যে মানদন্ডে হযরত মুহাম্মদ (সা.) পাশ করেছেন সেই মানদন্ডে তাঁর গোলামও পাশ করেছেন।

(২) দাবীর পরবর্তী জীবনে চরম বিরোধিতা নবীদের সত্যতার এক বড় দলিল। যেমন পবিত্র কুরআনে (সূরা ইয়াসিন-৩১) উল্লেখ রয়েছে–

অর্থাৎ- "পরিতাপ! বান্দাদের জন্য, তাদের নিকট এমন কোন রসূল আসে নাই যার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে নাই।" আমরা সবাই জানি, হযরত মুহাম্মদ (সা.) সত্য দাবীই করেছিলেন এর অর্থ এই নয় যে, তিনি কোন বাধার সম্মুখীন হননি। আমরা দেখতে পাই তিনি দাবীর প্রথম থেকেই চরম বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে থাকেন। আর দিন দিন বিরোধিতা বাড়তেই থাকে। অবশেষে তিনি দেশ ত্যাগ করতে পর্যন্ত বাধ্য হোন। তার পর যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ হয়। আজীবন হুযূর (সা.) কে চরম যুলুম-অত্যাচারের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে মক্কা বিজয় পর্যন্ত। অবশেষে চূড়ান্ত বিজয় আসে। কিন্তু এর নামতো ব্যর্থতা নয়। তিনি কি ব্যর্থ হয়েছিলেন? হাজার হাজার বিরোধীরা কি তাকে ধ্বংস করতে পেরেছে?

অনুরূপভাবে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)ও প্রথম থেকেই বিরোধিতার সম্মুখীন হতে থাকেন। দিনের পর দিন আক্রমণের মাত্রা বাড়তে থাকে। খৃষ্টান, হিন্দু, মুসলমান সবাই মিলিত ভাবে তাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে থাকে প্রবলভাবে। এমনকি খৃষ্টান পাদ্রীরা মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে মিথ্যা খুনের মামলা করে, আর মুসলমান মৌলানারা মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দেয়। কিন্তু মির্যা সাহেবের অপরাধ কি? অপরাধ এই যে, তিনি ইসলামের খেদমত করতে গিয়ে আল্লাহ্‌র আদেশে মাহদী হওয়ার দাবী করেন। আর এই দাবী যে, খৃষ্টান সহ অন্যান্য সব ধর্ম আজ বাতিল। একমাত্র ইসলামই সত্য ও আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম। আমি মাহদী হয়ে এসেছি ইসলামকে সব ধর্মের উপর বিজয়ী করার জন্য। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী যে, সারা জীবন বিরোধীরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। আর হযরত মির্যা সাহেব আজীবন সম্মান লাভ করে গেছেন। কোন জাগতিক শক্তি কোন দিন মির্যা সাহেবকে কোন প্রকার সাহায্য করেনি। সর্বক্ষেত্রে ও সব সময় আসমান থেকে আল্লাহ্‌র গায়েবী সাহায্যই মির্যা সাহেবের সাথে ছিল। ১৮৯১ সালে মৌলভী মোহাম্মদ হোসেইন বাটালভীর নেতৃত্বে দুই হাজার আলেম মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে কুফরী ফতোয়ায় স্বাক্ষর করেন, এর ফলশ্রুতিতে কি মির্যা সাহেব ধ্বংস হয়ে গেছেন? এ ছাড়া মির্যা সাহেব এর বিরুদ্ধে সেই সময় অনেক বড় বড় ষড়যন্ত্র হয়েছিল কিন্তু পরিশেষে কি দেখা গেল, এর যারা বিরোধিতা করেছেন তাদেরকে এমনভাবে

আল্লাহ্ তা'লা ধ্বংস করেছেন যে আজ তাদের বংশধর পর্যন্ত নেই। কিন্তু সেই সত্য দাবীকারকের বংশধরগণ আজ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের সেবা করে চলেছে। সমগ্র পৃথিবীতে আজ তার পতাকা পত পত করে উড়ছে। কারণ যিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মনোনীত হয়ে থাকেন তাকে বিজয়ী করা আল্লাহ্‌রই কাজ। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন: "আল্লাহ্ ফয়সালা করে নিয়েছেনে যে, নিশ্চয় আমি এবং আমার রসূলগণই বিজয়ী হবো। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী" (সূরা মুজাদেলা, আয়াত নং-২২)

এই আয়াত থেকে আমরা পরিস্কার ভাবে বুঝতে পারছি যে, যদি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আগমনকারীর দাবী সত্য হয়, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লা তাকে বিজয় দান করবেন এবং করেন। এখানে পরম বিজয়ের কথা বুঝানো হচ্ছে। যেমন আমরা দেখতে পাই–

(১) বিরুদ্ধবাদীদের নানা চ্যালেঞ্জের সামনে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বিজয় লাভ করেছেন।
(২) দোয়ার মোকাবেলায় তিনি বিজয় লাভ করেন।
(৩) আর্থিক ভাবেও আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বিজয়ী করেন।
(৪) একতাবদ্ধ করার দিক থেকেও তিনি বিজয়ী।
(৫) প্রচারের ক্ষেত্রেও তিনি বিজয়ী
(৬) দোয়ার কবুলিয়তের দিক থেকেও বিজয়ী
(৭) জ্ঞানের মোকাবেলায় তাঁকে বিজয়ী করা হয়েছে।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খন্ডে ইসলামের স্বপক্ষে ৩০০টি দলিল ও যুক্তি দেন এবং আর্য সমাজ ও খৃষ্ট সমাজের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ দেন যে, তোমরা যদি পুরোটা বা অর্ধেক, এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ বা এক পঞ্চমাংশও খন্ডন করতে পার, তাহলে ১০ হাজার রুপী পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার শক্তি আজ পর্যন্ত কারো হয়নি। এসব থেকে স্পষ্টই প্রস্ফুটিত যে ইমাম মাহদী (আ.) এর দাবী সত্য। চার দিক থেকে চরম বিরোধিতা সত্বেও ধীরে ধীরে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় যেভাবে প্রসারতা ও সমর্থন লাভ করেছেন, তেমনি তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর জামাত দ্রুত প্রসার লাভ করে চলছে। তাই উপরোক্ত আয়াত থেকে প্রমাণ হয়, যেভাবে পৃথিবীতে ইমাম মাহদীর জামাত প্রসারিত হচ্ছে তা তাঁর সত্যতারই সুস্পষ্ট এক দলীল।

(২) দাবীকারকের মৃত্যুর পরবর্তী কালে তার প্রতিষ্ঠিত জামাতের অগ্রগতি তাঁর সত্যতার দলিল:

দাবীকারকের সত্যতার আরো একটি বড় প্রমাণ হলো তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জামাতের অবস্থা। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেন: "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি পৃথিবীতে তাদের মধ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন যেভাবে তিনি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের জন্য সুদৃঢ় করে দিবেন তাদের ধর্মকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর উহাকে তিনি তাদের জন্য নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদত করবে, আমার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না। এবং এরপর যারা অস্বীকার করবে তারা হবে দুস্কৃতকারী " (সূরা নূর আয়াত-৫৬)

অনেক বুযুর্গ তফসীরকারকগণ লিখেছেন যে, এই আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত রসূল (সা.) এর পরে খেলাফতে রাশেদা কায়েম হয়েছিল। আর এই আয়াতের ভবিতব্য অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর পরেও ঐ রূপ খেলাফত কায়েম হবে। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর পরে খেলাফত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হযরত নবী করীম (সা.) এর হাদীসেও তা উল্লেখ রয়েছে। যেমন রসূল করীম (সা.) বলেন: হযরত নু'মান বিন বশীর হুযায়ফা হতে বর্ণিত হয়েছে যে–"হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে নবুওয়ত ততক্ষণ বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন অতঃপর, আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। এর পর নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ইহা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন যুলুম, অত্যাচার ও উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। তা ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম থাকবে যতক্ষণ আল্লাহ্ চাইবেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন তা অহংকার ও জবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে, এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন, অতঃপর, আল্লাহ্ তা'লা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন নবুওয়তের পদ্ধতিতে (অর্থাৎ মাহদী মাহুদ ও মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাম-এর আগমনের পর) পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর, হযরত আকদাস (সা.) নীরব হয়ে গেলেন।" (আহমদ-বাইহাকী)

উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর মাধ্যমে 'খিলাফত আলা মিনহাজেন্ নবুয়্যত' প্রতিষ্ঠিত হবে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে ইলহামের ভিত্তিতে "আল ওসীয়্যত" পুস্তকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর জামাতের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লা 'খিলাফতে আলা মিনহাজিন নবুওয়ত, কায়েম করবেন। সুতরাং তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক, তাঁর ইন্তেকালের পর ২৭শে মে, ১৯০৮ ইং সালে হযরত মৌলভী নুরুদ্দীন সাহেব (রা.), হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর অন্যতম সাহাবী, জামাতের প্রথম খলীফার পদ অলংকৃত করেন। সেই খিলাফত আজও বলবৎ রয়েছে এবং ২০০৮ সালে খিলাফতে আহমদীয়ার শতবার্ষিকী জুবিলী পালিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জামাতে আহমদীয়ার খিলাফত শত বৎসর পরেও অত্যন্ত সুন্দর, সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে প্রতিষ্ঠিত এবং উত্তম রূপে ক্রিয়াশীল ও তৎপর রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ইসতিখলাফে (সূরা নূর-৫৬) বর্ণিত খিলাফতের কার্য প্রণালী ও কার্যধারা এবং সকল বৈশিষ্টাবলী আহমদীয়া জামাতের কার্যক্রমের মাধ্যমে যথাযথ ভাবে সুসম্পাদিত হয়ে চলছে। যদি এটি প্রমাণ হয় যে, আহমদীয়া খিলাফতে উল্লিখিত সকল বৈশিষ্টাবলী বিরাজমান, তবে এটাও প্রমাণ হয় যে, হযরত মির্যা সাহেব সত্য দাবীকারক। কারণ তিনি যদি সত্য না হতেন তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পক্ষে দাঁড়াতেন না।

আলোচনা কালে আমরা বড় বিস্ময় এবং কৌতুহলের সাথে লক্ষ্য করছি যে, জামাতে আহমদীয়ার এই খেলাফতকে বানচাল ও বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে অতি সুপরিকল্পিতভাবে প্রচেষ্টা চলিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং আজও এই চেষ্টা চলছে। এখানে এই খিলাফতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ইতিহাস বর্ণনা উদ্দেশ্য নয়, বরং শুধু এতটুকু উল্লেখ করি যে, আহমদীয়া খিলাফতকে আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর হাতে এজন্য কায়েম করেছেন, যেন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ইসলাম সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করে। পৃথিবীর কোন শক্তিই এই জামাত এবং খিলাফতকে বিনষ্ট করতে সক্ষম হবে না। আমরা এটাও জানি, সত্যেরই বিরোধিতা হয়ে থাকে। হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সত্য দাবীকারক, তাই আজ তাঁর বিরোধিতা হচ্ছে যেভাবে বিরোধিতা হয়েছিল আমাদের মাওলা ও আকা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর। আর এটাও বলা যায় যে, আহমদীয়া জামাতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকার অর্থ প্রথমতঃ এই যে এটি আল্লাহ্‌র জামাত। দ্বিতীয়তঃ এই যে, আহমদীরা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে প্রথম সারির মুসলমান। কারণ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল না হলে তিনি এর মধ্যে 'খিলাফত' প্রতিষ্ঠা করতেন না। তৃতীয়তঃ হযরত মির্যা সাহেবের দাবী সত্য। চতুর্থতঃ এই জামাতের দ্বারা ইসলামের বিজয় হবে। আর এভাবে আহমদী ভাইয়েরা ইসলামের জন্য জান, মাল সবকিছু আল্লাহ্‌র খাতিরে ব্যয় (কুরবানী) করার সুযোগ পাচ্ছেন এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের ও নৈকট্য লাভের সুযোগ পাচ্ছেন। আলাহামদুলিল্লাহ।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা যে বিষয়টা উপলব্ধি করতে পারছি, তাহলো, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) নিজ দাবীতে সত্য। আর না হয় যেখানে আল্লাহ্ নিজে বলেছেন "মিথ্যা রচনা করে কিছু বললে জীবন-শিরা কেটে দিবেন।" (সূরা হাক্কা-৪৫-৪৮ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই দিনের পর দিন হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর জামাত দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি তিনি মিথ্যা হতেন তাহলে তো তাঁর জীবদ্দশাতেই এই জামাতকে আল্লাহ্ ধ্বংস করে দিতেন, তা নয় কি?

আলোচনার শেষে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর লিখনি থেকে সামান্য কিছু আলোকপাত করতে চাই।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেছেন: **"আমাকে অস্বীকার করা বস্তুত আমাকে নয়, বরং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-কে অস্বীকার করা হবে। কারণ, যে আমাকে 'মিথ্যা' সাব্যস্ত করে, সে আমার পূর্বে আল্লাহ্ তা'লাকে মিথ্যা বলে সাব্যস্ত করে।"** তিনি আরো বলেন: **"আমি দৃঢ়তা ও সংকল্পের সাথে বলছি যে, আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহ্‌র রহমতে এ ময়দানে আমারই বিজয় হবে। আমি দূরবীক্ষণ দৃষ্টিতে সমগ্র পৃথিবীকে আমার পদতলে দেখছি। সেই সময় অতি সন্নিকট, যখন আমি একটি মহান বিজয় লাভ করব। কেননা আমার কথার সমর্থনে আরও একজন কথা বলছেন। আমার হাতকে শক্তিশালী করার জন্য আরও একটি হাত কাজ করে চলছে। পৃথিবী তা অনুভব করছে না। কিন্তু আমি তা প্রত্যক্ষ করছি। আমার অভ্যন্তরে এক ঐশী শক্তি কথা বলছে। যা আমার প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি অক্ষরে নব জীবন সঞ্চার করছে। আকাশে এমন আন্দোলন সৃষ্টি হচ্ছে যা এক মাটির ঢেলাকে আল্লাহ্‌র আদেশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে"।** (রূহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড, পৃ. ৪০৩)।

মহান খোদা তা'লা পথহারা লোকদের হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর সত্যতা বুঝার ও তাঁকে গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন এবং ২৩শে মার্চের গুরুত্ব সবাইকে উপলব্ধি করার আর সেই সাথে বেশি বেশি দোয়া করার মন-মানসিকতা সৃষ্টি করুন, আমীন!

masumon83@yahoo.com

Newly Released

Please visit Pakkhik Ahmadi Website :

www.theahmadi.org

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit:

www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

জামেয়ায় ছাত্র ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এর সম্মানিত সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জামেয়া আহমদীয়া **বাংলাদেশ-এর সাড়ে সাত বছর মেয়াদী শাহেদ কোর্সে ১৩তম ব্যাচে 'ফসলুল খাসে' ছাত্র ভর্তি করা হবে।** আশা করা যাচ্ছে এ বছর ভর্তিচ্ছুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। দরখাস্ত আগামী ৩০/০৪/২০১৯ তারিখের মধ্যে সেক্রেটারী বোর্ড অব গভর্নরস জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ বরাবর পৌঁছাতে হবে। ১২,১৩,১৪ ও ১৫ মে ২০১৮ তারিখ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাল্লাহ্। **আবেদনকারীকে অবশ্যই শুক্রবার ১১ মে ২০১৮ তারিখ বিকাল ৫.০০ টার পূর্বে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের অফিসে পৌঁছে রিপোর্ট করতে হবে।**

আবেদনকারীর যোগ্যতা হবে নিম্নরূপ: (১) এস.এস.সি/এইচ.এস.সি-তে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং নূন্যতম "বি" গ্রেড থাকতে হবে। (২) এ বছর এইচ.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরাও আবেদন করতে পারবে। তবে এস.এস.সি-তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে, (৩) ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। (৪) সর্বোচ্চ বয়স সীমা, এস.এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৭ এবং এইচ. এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৯ বছর। (৫) ওয়াকফে নও ভর্ত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অগ্রাধিকার পাবে। (৬) কুরআন শুদ্ধভাবে পড়া অবশ্যই জানতে হবে, ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানে ভাল হতে হবে এবং জামাতি বই পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে। (৭) জীবন উৎসর্গকারী হতে হবে, (৮) ভাল আহমদী ও তাকওয়াশীল এবং জামাতি কাজে অংশগ্রহণকারী হতে হবে। (৯) আরবী, উর্দ্দূ ও ইংরেজী ভাল জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবে। (১০) বয়া'ত গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন বছর অতিক্রান্ত হতে হবে। (১১) ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও এপ্টিচিউড টেষ্টে ভাল ফলাফল করতে হবে। (১২) আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী অবশ্যই থাকতে হবে-অন্যথায় আবেদনপত্র গ্রহণ যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। আবেদনকারীর সঠিক ঠিকানা এবং বাড়ির অথবা জামাতের ফোন/মোবাইল নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। (ক) নিজের নাম, (খ)পিতার নাম, (গ) মাতার নাম, (ঘ) জম্ম তারিখ এবং বয়া'তগ্রহণকারী হলে বয়া'তের তারিখ উল্লেখ করতে হবে, (ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটো কপি সাথে দিতে হবে। (চ) দরখাস্ত নিজ হাতে লিখতে হবে, (ছ) স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট এবং কায়েদের সত্যায়ন থাকতে হবে নচেৎ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। (জ) জামাতি ও মজলিসি চাঁদা পরিশোধ মর্মে স্থানীয় সেক্রেটারী মাল/নাযেম মালের সার্টিফিকেট সংযুক্ত করতে হবে। (ঝ) ওয়াকফে নও হলে নম্বর উল্লেখ করতে হবে। (ঞ)অন্য কোন বিশেষ যোগ্যতা থাকলে উল্লেখ করতে পারেন। (ট) জামাতের এমন দুই জন বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে যিনি আবেদনকারী সম্বন্ধে ভালভাবে জানেন। (ঠ) জামাতের কোন বুযুর্গ (মৃত বা জীবিত) ব্যক্তির সাথে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে তবে তা উল্লেখ করতে হবে।

বি. দ্র. সার্কুলারটির বিষয়বস্তু ব্যাপকভাবে সকল স্থানীয় জামাত, হালকা ও পকেট সমূহে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। Fax: +880-2-7301854, E-mail: jamia.bd2006@gmail.com অথবা maazidullislam1955@gmail.com-এর মাধ্যমে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। প্রয়োজনে নিম্নের মোবাইল নম্বরসমূহে যোগাযোগ করা যাবে। সেক্রেটারী বোর্ড অফ গভর্নরস ০১৭৭১-৭০৫৫১৫, প্রিন্সিপাল ০১৫৩১-২৫১১৪০, অফিস সেক্রেটারী ০১৭৫৫-৫৬৫৩০৯/০১৯২২-০২৪৫৯১। মহান আল্লাহ্ তায়ালা সকলের সহায় হউন- আমীন।

ওয়াসসালাম

খাকসার

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ

সেক্রেটারী বোর্ড অফ গভর্নরস

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

ইসলাম: বিশ্ব-সমস্যা সমাধানের পথিকৃৎ

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

(৪র্থ কিস্তি)

অর্থনৈতিক মূল্যবোধ

ইসলাম অর্থনৈতিক পরিসীমায় সম্পদ-সম্পত্তির ওপর ব্যক্তির মালিকানাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয় এবং এর সুরক্ষা প্রদান করে বটে, তবে সমস্ত আইনি মালিকানা স্বত্ত্ব বিষয়টিকে কঠোর নৈতিক দায়বদ্ধতার বাঁধনে বেঁধে দেয়। এটি শিক্ষা দেয় যে, সব সম্পদের চূড়ান্ত উৎস, অর্থাৎ পৃথিবী এবং এর সমস্ত সম্পদ এবং সুযোগ-সুবিধা, সূর্য, চাঁদ, তারকারাজি, বৃষ্টি-বর্ষী মেঘমালা ইত্যাদি সবকিছুই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যা তিনি মানব ও প্রাণীকুলের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

এ প্রাসঙ্গিকতায় আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট করে বলেছেন–

اَللّٰهُ الَّذِیْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِیَ الْفُلْكُ فِیْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۳﴾ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۱۴﴾

(সূরা আল জাসিয়া ৪৫:১৩-১৪)

অর্থাৎ- আল্লাহই সমুদ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন যেন তাঁর আদেশে এতে নৌযানগুলো চলাচল করতে পারে এবং যাতে করে এর মাধ্যমে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার আর তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পার। (৪৫:১৩)

এবং যা কিছু আকাশসমূহে আর পৃথিবীতে যা কিছু আছে এর সবই তিনি তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। নিশ্চয়ই চিন্তাশীল লোকদের জন্য এতে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৪৫:১৪)

একই প্রসঙ্গে কুরআন করীমে আরো বলা হয়েছে–

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ﴿۳۳﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآىِٕبَیْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ ﴿۳۴﴾

(সূরা ইবরাহীম-১৪:৩৩-৩৪)

অর্থাৎ- আল্লাহ্ তিনিই, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেছেন। আর তিনি এর মাধ্যমে রিযক হিসাবে তোমাদের জন্য নানা প্রকার ফলফলাদি উৎপন্ন করেছেন। আর তিনি নৌযানগুলোকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন যেন তা তাঁর আদেশে সাগরে চলাচল করে। আর তিনি তোমাদের সেবায় নদনদীকেও নিয়োজিত করেছেন। (১৪:৩৩)

আর তিনি সর্বক্ষণ ঘূর্ণায়মান সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। আর তিনি, রাত-দিনকেও তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। (১৪:৩৪)

অবশ্য সম্পদ মানুষের দক্ষতা, জ্ঞান এবং শ্রমের সুষ্ঠু ও সঠিক প্রয়োগের দ্বারা উৎপাদিত হয়ে থাকে, যা মূলতঃ আল্লাহ তা'লাই নিজ করুণায় দান করেন। সুতরাং উৎপাদিত সম্পদ শুধুমাত্র মূলধন এবং শ্রমের ভিত্তিতেই নয়, বরং এ দুটি ছাড়াও সর্বস্তরের মানুষের মাঝে আর সাধারণভাবে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণার্থে ইসলাম সম্পদের বণ্টন নির্ধারণ করে দিয়েছে। এজন্য ইসলামে 'যাকাত' আদায় করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

যাকাত

শুল্কারোপের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভারসাম্য সুরক্ষিত রাখা একটি সুবিদিত ব্যবস্থাপনা। ইসলামে তেমনই এক ব্যবস্থাপনার নাম হলো 'যাকাত'। এ শব্দটির অর্থ হলো 'যা পরিশোধন ও পরিচর্যা করে'। যাকাত মূলধন বিনিয়োগ থেকে আয় ও শ্রমলব্ধ উপার্জন উভয়কে এভাবে পরিশুদ্ধ করে যে, উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত আয়ে সাধারণ জনগণের ভাগ রাখার পাশাপাশি জনকল্যাণের স্বার্থও দৃষ্টিপটে থাকে, যাতে সমাজের সকল স্তরের মানুষের উন্নতির পথে অগ্রযাত্রা সুসংগঠিতভাবে সম্মুখপানে এগিয়ে চলে।

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّیْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَیْهِمْ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ؕ وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ﴿۱۰۳﴾

(সূরা আত তাওবা-৯:১০৩)

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿۲۷۱﴾

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۲۷۲﴾

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿۲۷۳﴾

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ ۫ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿۲۷۴﴾ ع ۳۷

(সূরা আল্ বাকারা-২:২৬২-২৭৪)

অর্থাৎ- যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে তাদের দৃষ্টান্ত সেই শস্যবীজের ন্যায়, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ' শস্যদানা থাকে। আর আল্লাহ যার জন্য চান (এর চেয়েও) বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞ। (২:২৬২)

যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে (এবং) এরপর তারা যা খরচ করেছে সে অনুগ্রহের কোন খোঁটা দেয় না এবং কষ্টও দেয় না তাদের প্রতিদান তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে নির্ধারিত। তাদের কোন ভয় নাই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না। (২:২৬৩)

ন্যায়সংগত কথা বলা এবং ক্ষমা করা সে দান থেকে উত্তম যে (দানের) পর কষ্ট

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۷۵﴾

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۲۷۶﴾

اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۪ فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۷۷﴾ ع ۳۸

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۪ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿۲۷۸﴾

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۷۹﴾

يُّؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ؕ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۲۸۰﴾

অর্থাৎ- অতএব তারা কেবল তাদের পূর্বে গত হয়ে যাওয়া লোকদের দিনকালের অনুরূপ (দিনকাল) দেখারই অপেক্ষা করছে। তুমি বল, 'তবে তোমরা অপেক্ষা কর। নিশ্চয় আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান।' (৯:১০৩)

দান-খয়রাতকে যাকাতের সাথে যেন গুলিয়ে ফেলানো না হয়:

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় আর্থিক কুরবাণী গুরুত্বপূর্ণ এমন এক নির্দেশিত সৎকর্ম, যা প্রতিপালনে আল্লাহ্ যেমন সন্তুষ্ট হোন তেমনই তাঁর সৃষ্টিকূলও হয় উপকৃত। এ ক্ষেত্রে, যাকাত বিধিবদ্ধ এক আর্থিক কুরবাণী, যা ব্যক্তির কল্যাণলাভের নিমিত্ত হয় আর সামাজিকভাবে আর্থিক ভারসাম্য বজায় রাখায় সহায়ক ভূমিকা রাখে।

তবে দানশীলতার প্রতি ঘন ঘন মনোযোগ আকর্ষণ করে পবিত্র কুরআনে বিস্তারিতভাবে উপদেশ রয়েছে, উদ্দেশ্য হল আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তিতে মানুষের প্রশান্তি লাভ করা এবং পরিতৃপ্ত হওয়ার পথ সুগম করে দেয়া।

এ প্রেক্ষাপটে কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে–

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۶۲﴾

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿۲۶۳﴾

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ؕ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ ﴿۲۶۴﴾

দেয়া হয়। আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, পরম সহিষ্ণু। (২:২৬৪)

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের দানকে সেই ব্যক্তির মত নষ্ট করে দিও না, যে নিজের ধনসম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং সে আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না। তার দৃষ্টান্ত সেই মসৃণ শক্ত পাথরের ন্যায় যার উপর অল্প মাটি রয়েছে। এর উপর যখন প্রবল বৃষ্টিপাত হয় তখন (তা) একে নিরেট পাথররূপেই রেখে যায়। তারা যা উপার্জন করে এর কোন কিছুতেই তাদের কর্তৃত্ব নাই। আর আল্লাহ কাফিরদের হেদায়াত দেন না। (২:২৬৫)

আর যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় এবং তাদের আত্মার দৃঢ়তার জন্য খরচ করে তাদের দৃষ্টান্ত উঁচু জায়গায় অবস্থিত সেই বাগানের ন্যায় যেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হলে তা দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন করে। আর এতে যদি প্রবল বৃষ্টিপাত না-ও হয় তাহলে অল্প বৃষ্টিই (এর জন্য) যথেষ্ট। আর তোমরা যা করছো আল্লাহ তা দেখছেন। (২:২৬৬)

তোমাদের কারও (যদি) খেজুর ও আঙ্গুরের এমন একটি বাগান থাকে যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায় (এবং) এতে তার জন্য সব ধরনের ফল বিদ্যমান থাকে এবং তার সন্তানসন্ততি দুর্বল থাকা অবস্থায় সে বার্ধক্যে উপনীত হয় তখন এ (বাগানের) উপর এক অগ্নিময় ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে এটা পুড়ে যাক তা কি সে চাইবে? আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা চিন্তাভাবনা কর। (২:২৬৭)

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যা উপার্জন কর তা থেকে এবং যা আমরা তোমাদের জন্য জমি থেকে উৎপন্ন করি তা থেকেও পবিত্র জিনিস খরচ কর। আর (আল্লাহর পথে) খরচ করার বেলায় এ থেকে এমন বাজে কিছু (দান করার) সংকল্প করো না, যা তোমরা নিজেরাই লজ্জায় চোখ অবনত না করে কখনো গ্রহণ করতে প্রস্তুত নও। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, পরম প্রশংসাময়। (২:২৬৮)

শয়তান তোমাদের দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং তোমাদের অশ্লীলতার আদেশ দেয়। অথচ আল্লাহ নিজ পক্ষ থেকে তোমাদের ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞ। (২:২৬৯)

তিনি যাকে চান প্রজ্ঞা দান করেন এবং যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে নিশ্চয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে। আর বুদ্ধিমান লোক ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না। (২:২৭০)

আর তোমরা যা-ই খরচ কর অথবা তোমরা যা-ই মানত কর নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নাই। (২:২৭১)

তোমরা যদি প্রকাশ্যে সদকা দাও তা ভালো। আর তোমরা যদি তা গোপন কর এবং এ (সদকা) অভাবীদের দাও তাহলে তা তোমাদের জন্য (আরও) ভালো। আর তিনি (এ কারণে) তোমাদের অনেক দোষত্রুটি দূর করে দিবেন। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ পুরোপুরি অবগত। (২:২৭২)

অতএব, যাকাতকে দাতব্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সাথে একাকার করে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়, কেননা দানশীলতা পুণ্যকর্ম সাধনে এক উচ্চতর মর্যাদা রাখে, যা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই পসন্দনীয়।

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি
৮ই মার্চ, ২০১৮

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান বাইতুল ফুতুহ মসজিদ-এর নতুন প্রশাসনিক ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রশাসনিক ভবনের পুনর্নির্মাণ কাজ আরম্ভ।

গত ৪ মার্চ, ২০১৮ নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান প্রধান ও পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) মরডেনস্থিত বাইতুল ফুতুহ মসজিদ সংলগ্ন নতুন প্রশাসনিক ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

নতুন প্রশাসনিক ভবনের মধ্যে বহুমুখি কার্যোপযোগী হল, বিভিন্ন অফিস এবং অতিথিশালা পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে যা ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

এদিন আসরের নামাযের পর হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) নির্ধারিত জায়গায় ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এরপর হুযূরের সম্মানিত বেগম সাহেবা হযরত আমাতুল সবুহ বেগম এবং জামা'তের কেন্দ্রীয় ও জাতীয় প্রতিনিধিগণ যথাক্রমে এ কর্মসূচীতে অংশ নেন। হুযূর (আই.) নীরব দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের ইতি টানেন।

প্রকাশ থাকে যে, ২০১৫ সালের ২রা অক্টোবর জুমুআর খুতবায় এই অগ্নিকান্ড সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, **"প্রকৃত বিশ্বাসীদের জন্য ধৈর্যের সত্যিকার অর্থ জানা অত্যাবশ্যক। ধৈর্য মানে এই নয় যে, একজন মানুষ ক্ষতির কারণে দুঃখ বা বেদনা অনুভব করবে না। বরং এর অর্থ হল, তার এতটা হতাশায় নিমজ্জিত হওয়া উচিৎ নয় যে, সে জ্ঞান হারাবে এবং ভবিষ্যতে তার মনে আর কোন আশার সঞ্চার হবে না।"**

হুযূর (আই.) আরো বলেন, **"অবশ্যই দুঃখ করা স্বাভাবিক কিন্তু এর সাথে সাথে এই অবস্থা থেকে উত্তরণ করা এবং ভবিষ্যতে বড় কোন ধরণের সমস্যার ক্ষেত্রে সমাধানের উপায় খুঁজে বের করতে হবে। একইভাবে এই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে আমরা অঙ্গীকার করতে পারি এবং আমাদের কাজের যথার্থতা যাচাই করতে পারি, কীভাবে ভবিষ্যতে আমরা সফলকাম হব এবং আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিজেদেরকে উৎসর্গ করব।"**

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, **"যেমনটি আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, অগ্নিকাণ্ডের কারণে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। খোদার ইচ্ছায় আমরা এর চেয়েও অনেক সুন্দর এবং উত্তম ভবন তৈরী করব ইনশাআল্লাহ্ এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনস্বরূপ আন্তরিকতার সাথে বেশি বেশি সুবহানাল্লাহ্ এবং মাশাআল্লাহ্ পাঠ করব।"**

এই পূনর্নির্মাণ কাজটি খুব শীঘ্রই শুরু হবে এবং আশা করা যায় আগামী দু'বছরের মধ্যেই এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হবে। ইনশাআল্লাহ্।

দুই দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন
রাঙ্গামাটি জেলার আহমদীয়া নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাহিল্যা-বাঘাইছড়ি পুরস্কার বিতরণ ও অভিভাবক সম্মেলন এক ভিন্নমাত্রায় অনুষ্ঠিত

রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার ৩৭নং আমতলী ইউনিয়নের নিভৃত গ্রাম মাহিল্যায় অবস্থিত আহমদীয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ ও অভিভাবক সম্মেলন ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। ২৬মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ছাত্র-ছাত্রীদের 'মার্চ-পাষ্ট' ও বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। ২৭মার্চ মঙ্গলবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে সকাল দশ ঘটিকায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বর্ণিল সামিয়ানা সাজিয়ে মঞ্চ ও আসনবিন্যাসের সুব্যবস্থায় পুরস্কার বিতরণ ও অভিভাবক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৩৭নং আমতলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রাসেল চৌধুরী, কাচালং ডিগ্রি কলেজের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক বাবু লালন কান্তি চাকমা, কাচালং বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু ভদ্রসেন চাকমা, আমতলী ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য নুর আশা বেগম, পাবলাখালি পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আবু বকর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

জনাব মিলন সাহেবের উপস্থাপনায় পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের পর ত্রিপিটক পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মাহিল্যা আহমদীয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোফাজ্জল হক চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের সভাপতি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান সাহেব তার বক্তৃতায় বলেন, "আমরা মানব সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছি। এখানে উপস্থিত সকলের মাধ্যমে সবাইকে আমি জানাতে চাই, আমরা এখানে কোন ধর্ম ভিত্তিক কাজ করছি না, আমরা একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় ঠিকই, কিন্তু আমরা ধর্মকে ব্যবহার করে কোন কাজ করি না আর করবও না। আমরা দেশের স্বার্থে, মানবিক বিবেচনায়, মানবতার সেবায় এখানে কাজ করছি। আমরা চাই এই অনুন্নত এলাকার মানুষ শিক্ষিত হোক, দেশের উন্নয়ন হোক, দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ সবাই মিলে করুক, দেশকে ভালোবাসুক এবং দেশপ্রেমিক হোক, যাতে করে আমরা সামনে এগিয়ে যেতে পারি। আমরা আশা করব, অভিভাবকগণ সন্তানদের প্রতি মনোযোগ দিবেন, নিজেদের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন। বড় হয়ে যেন তারা, একেকজন বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার হয়। আর সুনাগরিক হয়ে দেশের উন্নতির ক্ষেত্রে তারা বিশেষ ভূমিকা রাখবে, এটাই আমাদের চাওয়া। আমি আশা করব, আপনারা সবাই নিজ

নিজ বাড়িতে গিয়ে সন্তানদের পিছনে সময় দিবেন, পড়ালেখার ক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগিতা করবেন আর এ লক্ষ্যেই আমাদের আজকের এই অভিভাবক সম্মেলন"।

বিশেষ অতিথিগণও উৎসাহব্যঞ্জক বক্তব্য রাখেন। ৩৭নং আমতলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রাসেল চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন, "আমতলী ইউনিয়নে আহমদীয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি অল্প সময়ের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে। এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ও পাশের হারও খুবই ভাল। এখানকার গরীব ছাত্রদেরকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পক্ষ থেকে স্কুলের পোশাক দিচ্ছে, টিফিন দিচ্ছে, বাড়ি থেকে স্কুলে আনার জন্য ইঞ্জিন চালিত নৌকার ব্যবস্থা করেছে এবং এই অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পড়ালেখা করার মত আলো দেখিয়েছে"। এই সেবামুলক কর্মকাণ্ডের জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি আরো বলেন, "ধর্মকে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার না করে দল-মত সবাইকে ভালোবাসতে হবে"।

কাচালং ডিগ্রি কলেজের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক বাবু লালন কান্তি চাকমা তার বক্তৃতায় বলেন, "ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার। এখানে এসে আমার বাস্তব উপলব্ধি তেমনটিই হচ্ছে, বিভিন্ন ধর্ম গোত্রের মানুষকে এখানে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে দেখে আমি নিজে গৌরববোধ করছি"। এছাড়াও গরীব ছাত্রদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়ানোর যে কাজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত করছে, এরও তিনি প্রশংসা করেন।

এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাবু ভদ্রসেন চাকমা, প্রধান শিক্ষক, কাচালং সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। তিনি তার বক্তৃতায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মানব সেবামূলক এ শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নতি কামনা করেন। পরিচালক ডিজিটাল সেন্টার, ৩৭নং আমতলী ইউ.পি., জনাব এম. আবুল খায়ের তার বক্তৃতায় বলেন, "এই অঞ্চলে ২০০৯ এর দিকে এস.এস.সি পড়ুয়া

কোন ছাত্র-ছাত্রী দেখাই যেতো না। শিক্ষার আলো থেকে এখানকার মানুষ ছিল অনেক দূরে, আর আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের এই স্কুলের মাধ্যমে বেশ কিছু ছেলে-মেয়ে এখন এস.এস.সি পাশ করে বিভিন্ন কলেজে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে"। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মানবোন্নয়নমুলক শিক্ষা বিস্তারের এ উদ্যোগকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

একইভাবে ৯ং ওয়ার্ডের মেম্বার নূর তৌহিদও বলেন, "আমার এলাকায় কোন স্কুল ছিল না, পড়ালেখা করতে হলে যেতে হত অনেক দূরে, যার ফলে পড়ালেখা করা এখানকার মানুষের জন্য ছিল অনেক কষ্টকর। কিন্তু, আজকে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত এখানে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে। বর্তমানে আমাদের গ্রামের অধিকাংশ সন্তানরা পড়ালেখা করছে। আহমদীয়া এই স্কুলে শুধু বাঙ্গালী নয় বরং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই অবাধে শিক্ষাগ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে"।

আমতলী শাখার আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রুবেল হোসেন তার বক্তৃতায় বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাত ধর্মের নামে কোন রাজনীতি করে না, তারা মানবসেবামূলক কাজ করে। তিনি আহমদীয়া জামা'তের বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করে ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানে আমতলী পুলিশ ফাঁড়ীর অফিসার ইনচার্জ জনাব আবু বকর শুভেচ্ছা বক্তৃতায় বলেন, এখানকার সবাই যেন শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করে যার যার ধর্ম পালন করে।

এছাড়া অভিভাবকদের পক্ষ থেকে সূচি কারবারী চাকমা ও দয়াল চাকমা উভয়েই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সফরসঙ্গী হিসেবে যারা যোগদান করেন, তারা হলেন- জনাব আব্দুর রহীম, মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন, মৌলবী এহতেশামুল বশীর, জনাব মাহমুদ আহমদ সুমন, জনাব মোহাম্মদ সানওয়ার এবং জনাব সিরাজুল ইসলাম।

উক্ত সম্মেলনকাল, স্কুল-প্রাঙ্গনে উপস্থিত ক্ষুদে ছাত্র-ছাত্রী অতিথীবৃন্দ ও অভিভাবকসহ প্রায় পাঁচ শতাধিক জনসমাগমে, উৎসব-আমেজে মুখর ছিল। অনুষ্ঠানের সংবাদ স্থানীয় ও জাতীয় অনলাইন পত্রিকা গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে।

সুমন মাহমুদ

সংবাদ

সংকলন: **মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী**

সীরাতুন নবী (সা.) জলসা ও তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

মজলিস আনসারুল্লাহ্ সুন্দরবনের সৌজন্যে গত ২৬/০২/২০১৮ রোজ সোমবার বাদ মাগরিব ছোটভেটখালী মসজিদ নূরে সীরাতুন নবী (সা.) ও তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন রিজিওনাল নাযেমে আলা জি.এম. আব্দুর রাজ্জাক।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আহমদ আলী মোল্লা, নযম পরিবেশন করেন যয়ীমে আলা এম. এম. রফিকুল ইসলাম। বক্তৃতা করেন জি.এম. সাব্বির আহমদ, এস.এম. আবু আহমদ এবং মাওলানা মোহাম্মদ আমীর হোসেন জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। সভায় উপস্থিত ছিল ৮ জন জেরে তবলীগ সহ ১১২ জন। বক্তৃতার পর জেরে তবলীগ ভাইদের প্রশ্নের উত্তর দেন মাওলানা আমীর হোসেন ও রিজিওনাল নাযেমে আলা আব্দুর রাজ্জাক সাহেব। সভাপতি সাহেবের দোয়া ও বক্তব্যের মাধ্যমে সভা শেষ হয়।

এম. এম. রফিকুল ইসলাম

লাজনা ইমাইল্লাহ্ বড়ভেট খালি (সুন্দরবন) তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ রোজ বৃহস্পতিবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ বড়ভেটখালীর উদ্যোগে এক তবলিগী সেমিনারের আয়োজন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। সেমিনারটি কুরআন তেলাওয়াত এবং দোয়ার মাধ্যমে শুরু হয়। এরপর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শান, মর্যাদা ও ভালবাসা নিয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরমা রোকসানা মঞ্জুর। এরপর হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যবহারিক জীবন নিয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরমা ফতেমা আহমদ। এরপর তবলিগ গাইড, আহমদীয়াতের ধর্ম বিশ্বাস পড়ে শুনান আরিফা এদিব চৌধুরী। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৮৩ জন সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

শাহানারা, প্রেসিডেন্ট

সুন্দরবন মজলিসের উদ্যোগে ওয়াকারে আমল অনুষ্ঠিত

মজলিস আনসারুল্লাহ্ সুন্দরবনের উদ্যোগে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি বা ফজর এক ওয়াকারে আমলের আয়োজন করা হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবনের কবরস্থানে যাওয়ার পথের দুধারে মাটি দিয়ে সংস্কার করা হয়। স্থানীয় আমীর জনাব এস. এম. রেজাউল করিম এর দোয়ার মাধ্যমে ওয়াকারে আমল শুরু হয়। একটানা ২ ঘন্টা কাজ করার পর কাজ শেষ হয়। ওয়াকারে আমলে সর্বমোট ৩৭ জন আনসার সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ওয়াকারে আমল শেষে নাস্তা দেওয়া হয়। নাস্তা শেষে পুনরায় মাওলানা আমীর হোসেন সাহেব এর দোয়ার মাধ্যমে ওয়াকারে আমলের কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

গাজী মিজানুর রহমান

আহমদনগর জামা'ত, পঞ্চগড় দিনব্যাপী নও মোবাঈনদের তালিম তরবিয়তী প্রশিক্ষণ ক্লাস অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমদনগরের উদ্যোগে গত ২৮ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার সারাদিন ব্যাপী নওমোবাঈনদের সমন্বয়ে নওমোবাঈন তালিম তরবিয়তী প্রশিক্ষণ ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আগের দিন সন্ধ্যারাত থেকে প্রত্যন্ত এলাকা থেকে নওমোবাঈন সদস্য-সদস্যাগণ আহমদনগর মসজিদে উপস্থিত হয় এবং পরের দিন সকাল ১০টা পর্যন্ত মেহমানগণ আসতে থাকেন। মাগরীবের নামাযের পর থেকে নওমোবাঈনদের নাম রেজিঃ করা হয়। প্রথম অধিবেশন সকাল ১০টা থেকে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ক্লাস শুরু হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন নওমোবাঈন সদস্য মোহাম্মদ রাফসান মুন্সী সাহেব। দোয়া এবং উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন আহমদনগর জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব যোগল সাহেব। তিনি নওমোবাঈনদের উদ্দেশ্যে কিছু শিক্ষামূলক বিষয় তুলে ধরেন যেমন, আহমদীয়াত কি? আহমদী জামা'তের দর্শন, বিশ্বব্যাপী ও দেশীয় প্রেক্ষাপটে আহমদীয়াত সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। এরপর নওমোবাঈনদের পরিচিতি পর্ব হয়। ডা: রেজাউল করীম তবলীগ সেক্রেটারী সাহেব তবলীগের গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য দেন। তাহের আহমদ বাচ্চু সেক্রেটারী তরবিয়ত সাহেব, জামা'তের চাঁদা, ওয়াকফে জাদীদ চাঁদা, তাহরীকে জাদীদ চাঁদার ওপর আলোচনা করেন। মোহাম্মদ রাফসান মুন্সী সাহেব নওমোবাঈন সদস্য, নওমোবাইনদের অবশ্যই করণীয় সার্কুলার পাঠ করে শুনান এবং এই সার্কুলার কপি করে সকলের মাঝে বিতরণ করা হয়। যোহরের নামায বাদ দ্বিতীয় অধিবেশনে বয়আতের ১০টি শর্তের ওপর আলোচনা করেন মোয়াল্লেম মোহাম্মদ ইয়াহিয়া সাহেব।

তারপর মাওলানা মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন প্রধান, সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আর্জি এবং এডিশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত ওয়াকফে জাদীদ নওমোবাঈন সাহেব, ঈমানের ৬টি বিষয়, ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ, নবী করীম (সা.)-এর পাঁচটি অন্যন্য বৈশিষ্ট, রসূলে করীম (সা.) শেষ শরীয়ত দাতা নবী, উদ্দেশ্য অনুযায়ী কর্মের প্রতিফল পাবে এ সকল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তাহরীকে জাদীদ কি এবং কেন, এর পটভূমি, তাহরীকে জাদীদের ২৭টি মোতালেবাত (দাবীসমূহ) পাঠ করে শুনান ও সফলতা লাভ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

এই তালিম তরবিয়তী প্রশিক্ষণ ক্লাসে ৩৫ জন নওমোবাঈন ও ৬ জন যেরে তবলিগসহ মোট ৬০ জন সদস্যা-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। যেরে তবলীগদের মধ্য থেকে ৪ জন বয়আত করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতে দাখিল হয়। নামায বাদ আসর এই বয়আত পরিচালনা করেন মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মোয়াল্লেম সাহেব। তারপর দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মাওলানা মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন প্রধান

লাজনা ইমাইল্লাহ আহমদনগরের উদ্যোগে তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ২৫/০১/২০১৮ তারিখ হতে ২৭/০১/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমনগরের উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী নাসেরাতুল আহমদীয়ার তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। প্রথম দিন কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে ক্লাস শুরু হয়। তিনদিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাসে সিলেবাসে বর্ণিত বিষয়বস্তুর ওপর ক্লাস নিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরিশেষে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে তালিম তরবিয়তী ক্লাসের সমাপ্তি হয়। উক্ত তালিম তরবিয়তী ক্লাসে ৪৭ জন নাসেরাত ও ১০ জন লাজনা অংশ গ্রহণ করেন।

মিলা পাটোয়ারী
সেক্রেটারী ইশায়াত, আহমদনগর লাজনা ইমাইল্লাহ

নূরনগর-ঈশ্বরদীতে এক তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত

গত ০২/০৩/২০১৮ তারিখ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত নূরনগর-ঈশ্বরদীতে নামাযের পর এক তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মুহাম্মদ আশরাফ আলী খান। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মুহাম্মদ মাসরূর আহমদ, নযম পরিবেশন করেন জনাব মুহাম্মদ মুক্তার হোসেন। এরপর আলোচনা পর্বে একজন আহমদীর দায়দায়িত্ব কি সে সম্পর্কে আলোচনা করেন মুহাম্মদ তৌফিক জামান, আহমদী ও গয়ের আহমদীর মধ্যে পার্থক্য বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব সাব্বির আহমদ। তরবিয়তী বিষয়ে হুযুরের দিকনির্দেশনার ওপর আলোচনা করেন জনাব মাওলানা মুহাম্মদ বিপ্লব শাহ মুরব্বী সিলসিলা ও জামাতের সকল সদস্যের কি করণীয় এ বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব জাসিদুজ্জামান এবং পরিশেষে সভাপতি সাহেব বর্তমান যুগই যে আখেরী যামানা এবং যামানায় যে একমাত্র মাহদী (আ.)-এর নেতৃত্ব ছাড়া পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হওয়ার কোন পথ নাই এ বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। অত:পর দোয়ার মাধ্যমে তিনি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ২৬ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মদ আশরাফ আলী খান

বিভিন্ন জামা'তে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপিত হয়

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

গত ২০/০২/২০১৮ তারিখ রোজ মঙ্গলবার বাদ মাগরিব থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ-এ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে মহান মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত মহতী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব কাওসার আহমদ মঞ্জুর। উর্দূ নযম পরিবেশন করেন জনাব ইশতিয়াক আহমদ অলড্রিন। অনুষ্ঠানে "মুসলেহ মাওউদ দিবস কি এবং কেন" এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব আফসার মোল্লা, সেক্রেটারী ওয়াকফে নও। "হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর কর্মময় জীবনের কিছু ঝলক" শিরোনামে আরেকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব নূরুল হুদা আরজু, যয়ীম আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ্। "ইসলামের সেবায় হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)" বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মৌলানা এস. এম. আবু তাহের, মোয়াল্লেম, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এবং "মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা" বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা জহির উদ্দিন আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ। সবশেষে সভাপতি মোহতরম মঞ্জুর হোসেন আমীর সাহেবের, জ্ঞানগর্ব ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সর্বমোট উপস্থিত ছিল ৩০১ জন।

আব্দুল আউয়াল মাস্টার
সেক্রেটারী তরবিয়ত, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া

আহমদনগর

গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ লাজনা ইমাইল্লাহ আহমদনগরের উদ্যোগে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে কুরআন তেলাওয়াত করেন নুদরত জাহান। হাদীস শরীফ পাঠ করেন নিশাত জাহান। নযম পরিবেশন করেন ফাইজা সুলতানা ইমা। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর কর্মময় জীবন সম্পর্কে বলেন ফারজানা শাওন। বাঙালি জাতির প্রতি আহমদীয়াতের আহ্বান হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন বিলকিস তাহের। ইসলাম প্রচারে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর অসাধারণ কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করেন নাছিমা বশির। এরপর হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর কর্মময় জীবনের কিছু দিক নিয়ে সর্বশেষ বক্তব্য প্রদান করেন আফরোজা মতিন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে সভা শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৯৭ জন লাজনা ও ১৬ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

মিলা পাটোয়ারী

কটিয়াদী

গত ২৪/০২/২০১৮ তারিখ রোজ শনিবার বাদ যুহর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কটিয়াদি মজলিস আনসারুল্লাহ্ বৈরাগীর চরের ব্যবস্থাপনায় মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপিত হয়। উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন জনাব এম, এ হান্নান, প্রেসিডেন্ট কাটিয়াদি। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব সাগর আহমদ। নযম পরিবেশন করেন জনাব মোহাইমিনুর রহমান লাকি। বক্তৃতা প্রদান করেন মৌলবী ইসমত উল্লাহ্ মিয়াজী, মোয়াল্লেম কটিয়াদী। জনাব রুহুল আমীন, জেনারেল সেক্রেটারী কটিয়াদি। নযম পরিবেশন করেন জনাব ফয়সাল আহমদ খাদেম, জনাব এড. আজিজুল হক, (ভাইস প্রেসিডেন্ট কটিয়াদী), জনাব নজরুল ইসলাম (জেলা নাযেম কিশোরগঞ্জ)। জনাব এম. এ. হান্নান, (প্রেসিডেন্ট কটিয়াদি।) দোয়া পরিচালনা করেন এড: আজিজুল হক এবং প্রেসিডেন্ট সাহেবের সমাপ্তি ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৪৬ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

ইসমত উল্লাহ্ মিয়াজী

তাহেরাবাদ

ক) গত ২০ ফেরুয়ারি বাদ আসর হতে মুসলহে মাউদ (রা.) দিবসের উপর আলোচনা অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট আলহাজ্জ মোহাম্মদ ইউনুস আলী সাহেবের সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। পবত্রি কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন ও শাহেনুর রহমান কনক। পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন, মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আঃ রাজ্জাক আউয়াল, আঃ খালকে মোল্লা, জিন্নাত আলী, মোয়াল্লেম ফরহাদ হোসেন এবং সবশেষে সভাপতি সাহবে সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করনে। ৪৫ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছলিনে। দোয়া করে সভাপতি সাহেব সভা সমাপ্তি করেন।

মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন

খ) আনসারুল্লাহ্ তাহেরাবাদের উদ্যোগে গত ২৬/০২/২০১৮ তারিখ বাদ আছর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রিজিওনাল নাযেম আলা জনাব মোহাম্মদ আব্দুল খালেক মোল্লা, পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন যয়ীম জনাব মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, নযম পরিবেশন করেন মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন ও মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, উক্ত অনুষ্ঠানে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস সম্পর্কে নিম্নের বক্তাগণ জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেন। মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, মোহাম্মদ জিন্নাত আলী প্রামাণিক, মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন মোয়াল্লেম। পরিশেষে সভাপতি সাহেব জনাব আব্দুল খালেক মোল্লা দোয়ার মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান

উথলী

গত ২৩/০২/২০১৮ তারিখ বাদ জুমুআ উথলী মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র উদ্যোগে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মহিউদ্দিন আহমদ রিপন। কুরআন তেলাওয়াত, নযম ও মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব বশিরুর রহমান, যয়ীমে আলা, জনাব মোহাম্মদ তাহের খালিদ, মুরব্বী সিলসিলা জনাব মাওলানা খোরশেদ আলম, জানাব শাহিনুর রহমান, জনাব মহিউদ্দিন আহমদ রিপন সাহেব সবশেষে সভাপতি দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সামাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত সভায় আনসার খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা, নাসেরাত সহ মোট ২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ তাহের খালিদ (রুমী)
যয়ীমে আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ্, উথলী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুর

গত ১৩/০৩/২০১৮ তারিখ মঙ্গলবার বিকাল ৪ টায় লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুরের উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রথমে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মিসেস আমাতুল মজিদ সাহেবা এবং নযম পরিবেশন করেন মিসেস তাহেরা মজিদ (ফতুল্লা)। এরপর ২০ ফেব্রুয়ারির তাৎপর্য, মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর খিলাফতের প্রথম ভাষণ, তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী এবং তাঁর জীবনের ওপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন যথাক্রমে মিসেস মোস্তারিন আক্তার, আমাতুর মতিন, সালেহা আক্তার এবং মিসেস আমাতুল মজিদ সাহেবা। এছাড়া বাংলা নযম পরিবেশন করেন মিসেস রানু বেগম [চট্টগ্রাম]। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠানে মোট উপস্থিতি ছিল ১৯ জন।

আমাতুল মজিদ
সেক্রেটারী তালিম ও তরবীয়ত

পুরুলিয়া

ক) আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, পুরুলিয়ার উদ্যোগে গত ২০ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বাদ আসর হতে স্থানীয় মসজিদে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত হয়। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব আব্দুস সাত্তার সাহেব এরপর কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সাব্বির আহমদ বক্তব্য রাখেন মৌলবি মজিদুল ইসলাম সাহেব, আরো বক্তব্য রাখেন মোয়াল্লেম আব্দুর রহমান, আল-আমিন হক তুষার (সেক্রেটারী মাল) সবশেষে সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট উপস্থিতি ৩৭ জন।

হাফিজুর রহমান, প্রেসিডেন্ট

খ) লাজনা ইমাইল্লাহ্ পুরুলিয়ার উদ্যোগে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রোজ শুক্রবার মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট সাহেবা লাজনা ইমাইল্লাহ্

পুরুলিয়া। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন শারমিন আক্তার। অত:পর হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন– ঝর্ণা আক্তার, মোহসিন আক্তার প্রমুখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ সদস্যবৃন্দ। এতে মোট ৩৭ জন সদস্যা উপস্থিত ছিলেন । সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ময়না
প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ পুরুলিয়া

চান্দপুর চা বাগান

গত ০২/০৩/২০১৮ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চান্দপুর চা বাগানের উদ্যোগে বায়তুস সামি মসজিদে বাদ জুমুআ স্থানীয় প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব হাসেম আহমদ চৌধুরী (আরাফ)। নযম পরিবেশন করেন জনাব ছারোয়ার হোসেন চৌধুরী (রাসেল)। দিবসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করেন জনাব মাহমুদ আহমেদ চৌধুরী (বুলবুল) যয়ীম স্থানীয় মজলিস আনসারুল্লাহ্, জনাব মৌলানা মিজানুর রহমান, স্থানীয় মোয়াল্লেম। সভাপতি সাহেবের সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভা সমাপ্ত করা হয়।

মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাজশাহী

গত ০৪/০৩/২০১৮ লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাজশাহীর পক্ষ থেকে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। এতে প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহতরমা রাশেদা করিম। দোয়া পাঠ করেন লাজনার প্রেসিডেন্ট সাহেবা। নযম পাঠ করেন মেহনাজ করিম এশা। মুসলেহ্ মাওউদ দিবস কি, এর তাৎপর্য ও পটভূমি আলোচনা করেন রাশেদা করিম সাহেবা। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর বাল্যকালের ওপর আলোচনা করেন নাসেরাত নুসরাত জাহান ঐশী এবং মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর খেলাফতের অবদান আলোচনা করেন মোহতরমা মাহমুদা খাতুন। সবশেষে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর বর্ণাঢ্য জীবন নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন মোহতরমা হাদিকাতুল জান্নাত, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাজশাহী এবং দোয়ার মাধ্যমে সভা শেষ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৩৯ জন সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

আকলিমা খাতুন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ বড়ভেটখালী

গত ২৬/০২/২০১৮ তারিখ রোজ সোমবার বাদ আসর বায়তুস সোবহান মসজিদে লাজনা ইমাইল্লাহ্ বড়ভেটখালী (সুন্দরবন) এর উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন সভানেত্রী সাহেবা। এরপর নযম ও মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিকের ওপর বক্তব্য পেশ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সর্বমোট ৫১ জন সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। সভানেত্রী সাহেবার সমাপনী বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সমাপ্তি করা হয়।

শাহানারা, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্

খাকদান

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খাকদান গত ২০ ফেব্রুয়ারি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করে, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন তাহের আহমদ, নযম পরিবেশন করেন সুলতান আহমদ (যয়ীম)। বক্তৃতা করেন জনাব জালাল আহমদ মাষ্টার রিজিওনাল নায়েমে আলা, বরিশাল, জনাব সাদেক আহমদ মোয়াল্লেম, জনাব কাওসার আহমদ, প্রেসিডেন্ট কাউনিয়া। এরপর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। এতে মোট ৩৭ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সাদেক আহমদ

জলসা পরবর্তী পূণর্মিলনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে ভাতগাঁও গড়েয়া বাজারে মুহাম্মদ হামিদুল ইসলাম সাহেবের অফিসে গত ২২ ফেব্রুয়ারি রোজ সোমবার বাদ মাগরিব ৯৪তম সালানা জলসা ২০১৮। এরপর পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আহমদীয়া জামাতের পরিচিতিমূলক লিফলেট পাঠ করে শুনানো হয়। এরপর ৯৪তম জলসার ৩ দিনের ৩টি বুলেটিন উপস্থাপন করা হয়, বুলেটিনে বক্তাগণের ফটো, অতিথিগণের ফটো এবং তাদের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করা হলে আহমদীয়া জামাতের পক্ষে ইসলামের সেবামূলক কর্মকান্ড শুনে অতিথিরা ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে এলাকার সমাজ সেবক, কাউন্সিলর, ইউনিয়নের অন্যান্য জননেতাসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ২০ জনের এই সভায় ১০টি লিফলেট, ৫টি নামায শিক্ষা পুস্তিকা বিতরণ করা হয়।

মাওলানা শাহ আলম খান

ফাজিলপুর লাজনার বনভোজন

গত ২৪ জানুয়ারি বুধবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুরের উদ্যোগে সকাল ৬ টায় সীতাকুন্ড ইকোপার্ক-এ বনভোজনের জন্য আমরা রওয়ানা দেই। ডেম্যু ট্রেনে করে সীতাকুন্ড ষ্টেশনে নেমে আমরা লাজনা, নাসেরাত, শিশু ও দুইজন আনসারসহ ইকোপার্কের উদ্দেশ্যে বাসে করে গিয়ে গেটে নামি, আমরা সবাই সকাল ১০ টার সময় হেঁটে হেঁটে পাহাড়ি পথে উপরে উঠি। এই ইকোপার্কে দু'টি ঝরণা রয়েছে একটির নাম "সুপ্ত ধারা"। যা সারা বছর ঘুমিয়ে থাকে বর্ষায় জেগে ওঠে। অপরটির নাম "সহস্র

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকার উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন

গত ২৩/০৩/২০১৮ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকার উদ্যোগে দারুত তবলিগ মসজিদ ৪নং বকশীবাজার, ঢাকায় "মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস" পালিত হয়। ঢাকা জামা'তের মোহতরম আমীর, আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব সভাপতিত্ব করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ঢাকা জামাতের বিভিন্ন হালকার আহমদীগণ উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

বাদ আসর বিকাল ৪.০০ টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। পবিত্র কুরান থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব সামির আহমদ সাহিল। উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব মাহমুদ হোসেন আসিফ। প্রথমে মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান সাহেব "হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কর্মময় জীবনের এক ঝলক" শীর্ষক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মরহুম মৌলভী সলিমুল্লাহ সাহেব রচিত নাজমুল মাহদী থেকে একটি বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব নাসের আহমদ দোলন।

অতঃপর "আহমদীয়াতের ইতিহাসে ২৩ মার্চ"-এর গুরুত্বের উপর বক্তৃতা করেন আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব, সদর মুরব্বী। তিনি এযুগে ইসলামের পূনর্জাগরণ, প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী , মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর প্রতিশ্রুত আগমন এবং ঐতিহাসিক ভূমিকার উপর সবিস্তার আলোকপাত করেন। ঢাকা জামা'তের বিভিন্ন হালকা থেকে আহমদীগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনেকে সপরিবারে অংশগ্রহণ করেন। যেরে-তবলিগ মেহমানরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির ভাষণে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনাদর্শ নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম মোবাশশের উর রহমান সাহেব, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব ইজতেমায়ী দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বশীর উদ্দীন আহমদ
জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা

ধারা"। এটি দেখার জন্য সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১০০০ ফুট উপরে উঠতে হয়। আমরা সকলেই হেঁটে হেঁটে এই ১০০০ ফুট উপরে উঠেছি। এরপর সেখান থেকে আবার ৪৮৩ টি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে সেই "সহস্র ধারা" ঝর্ণা দেছি। ঝর্ণার পানিতে হাত মুখ ধুয়ে সেই পানি দিয়ে আমরা সবাই "বিরানী" খেতে বসলাম। খাওয়া সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার ৪৮৩ টি ধাপ বেয়ে নীচে নেমে আসি। সি এন জিতে করে গেটের কাছে এসে এখানে পিকনিক স্পটে বসে বাচ্চাদের দৌড় প্রতিযোগিতা, নাসেরাতদের বুদ্ধির দৌড় এবং লাজনাদের কুইজ প্রতিযোগিতা নেওয়া হয় এবং পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিকাল ৪টার দিকে সবই ইকোপার্ক থেকে বের হয়ে বাসে চড়ে ষ্টেশনে আসি। সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে টেম্পুতে চড়ে আবার ফাজিলপুর ষ্টেশনে ফিরে আসি। সবাই বিদায় নিয়ে যার যার বাড়ি ফিরে আসি। আল্লাহ্‌র রহমতে মঙ্গলমতই সকলে বনভোজন উপভোগ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ্। এই প্রোগ্রামে আমরা মোট ২২ জন অংশগ্রহণ করি ।

আমাতুল মজিদ
সেক্রেটারী তালীম তরবিয়ত
লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুর

লাজনা ইমাইল্লাহ্ রংপুরের উদ্যোগে বনভোজন অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ রংপুরের উদ্যোগে গত ০৩/০২/২০১৮ তারিখ রোজ শনিবার স্থানীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে বার্ষিক বনভোজন উদযাপন করা হয়। উক্ত বনভোজনে লাজনা, নাসেরাত মিলে মোট ৪৫ জন অংশ গ্রহণ করে। দোয়ার মাধ্যমে শুরু হয় বিভিন্ন খেলাধূলা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন। দুপুরে মধ্যাহ্নভোজের পর পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

দিলরুবা জামান, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ রংপুর

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে বার্ষিক বনভোজন আয়োজন করা হয়। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে বনভোজনের কার্যক্রম শুরু হয়। উক্ত বনভোজনে লাজনা ও নাসেরাতদের গ্রুপ অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের খেলাধূলা প্রতিযোগিতা নেওয়া হয়। দিনশেষে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে বনভোজনের সমাপ্তি হয়। এতে ৬৫ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

মিলা পাটোয়ারী, সেক্রেটারী ইশায়াত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাজশাহীর বার্ষিক বনভোজন ও খেলাধূলা অনুষ্ঠিত

গত ০৩/০৩/২০১৮ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাজশাহীর উদ্যোগে বনভোজন ও খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে লাজনা ২২ জন, নওমোবাঈন ৩ জন, নাসেরাত ৬ জন এবং শিশু ৮ জন সহ মোট ৩৯ জন সদস্যা অংশ নেয়।

আকলিমা খাতুন

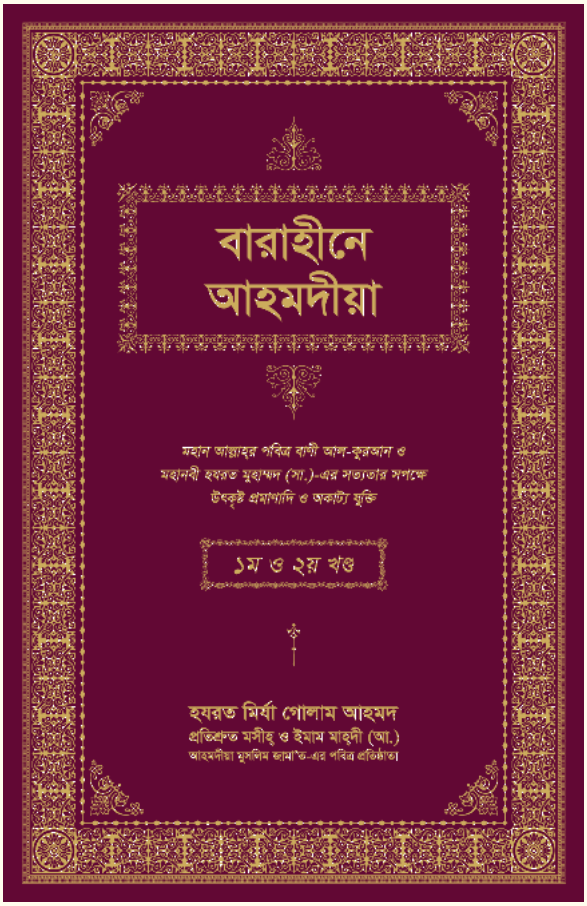

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার প্রকাশ হয়।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

Right Management Consultants
Software Developer & MIS Solution Provider
Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

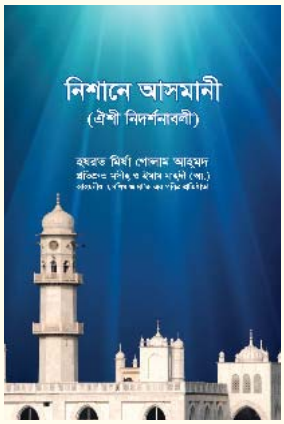

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) **'নিশানে আসমানী'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৬ সালে প্রণয়ন করেন।

এ বইটির মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঐ সব বুযূর্গের মধ্য হতে দুইজন বুযূর্গ মজযুব গোলাব শাহ্ এবং নেয়ামতউল্লাহ্ ওলী'র সেসমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন যা ইমাম মাহ্দী আগমনের লক্ষণাবলী ও সত্যতা প্রকাশ করে।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

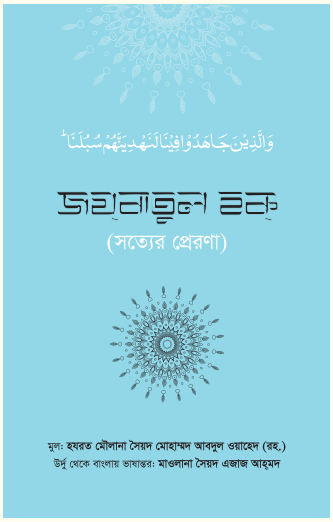

জয্বাতুল হক্ (সত্যের প্রেরণা) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রখ্যাত আলেম হযরত মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.) সাহেবের আধ্যাত্মিকতার পথে মহাসংগ্রামের ধারাবাহিক বিবরণ। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে আত্মিক প্রশান্তির সাথে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম খলীফার হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। তার নিজের লেখা বইটি (মূল উর্দু) ছাপাখানায় থাকা অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

পরবর্তীতে তার সুযোগ্য সন্তান মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে এখন তার উত্তরসূরিগণ পুনরায় যথাযথ অনুমোদন নিয়ে বইটি পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

আমরা আশা করি যারা এই বইটি পড়বেন তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভের প্রেরণা পাবেন। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল। বইটির শুভেচ্ছা মূল্য ২০/- টাকা মাত্র।

New Vol. No. 80 | 18th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

31st March, 2018 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

তোমরা যদি জান যে, আগামীকাল কেয়ামত হবে, তবে আজ হলেও একটি গাছ লাগিয়ে যাও– বৃক্ষ রোপণ সদকায়ে যারিয়া।

আল হাদীস

সুবংশে সুসন্তান শুধীজনে কয়
সুবীজে সুফসল জানিবে নিশ্চয়

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
সাবেক ন্যাশনাল আমীর

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই

"জিসমী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শাওক্বিন 'আলা ইয়া লাইতা কানাত্ কুওওয়াতুত্ ত্বাইরানী"

তোমার পানে আমার দেহ উড়ে চলে যেতে যে চায়
থাকতো যদি সাধ্য আমার ভর করে সেই স্বপ্নডানায়

-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

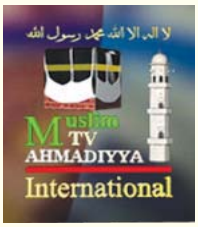

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)